বেদুইনের দেশে

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রকাশক
শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা-১২

নূতন সংস্করণ
অগস্ট ১৯৫৯

মুদ্রাকর
শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার বসু
শ্রীজগদীশ প্রেস
৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-১৯

ভূমিকা

'আরব্য রজনী' অনেকেই পড়েছেন—'বেদুইনের দেশে' বইখানা হল আরব্য দিবা। রাত এবং দিনে অনেক প্রভেদ 'বেদুইনের দেশে' পাঠ করলে সেরূপ প্রভেদ দেখতে পাবেন। আরব দেশের রাত আরামের এবং দিন মহাকষ্টের। 'বেদুনের দেশে' সেই কঠোর সত্যের প্রতিচ্ছবি দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

স্মরণে—

যাঁরা ভারতের জাতীয় মুক্তির জন্য
নামের প্রত্যাশী না হয়ে সবই
দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন
তাঁদের পবিত্র করকমলে
"বেদুইনের দেশে"
অর্পিত হ'ল।

গ্রন্থকার

বেদুইনের দেশে

ইরাক

ইরানের শীতল পার্বত্যভূমি পার হয়ে, ইরাকের নিকট এসে বুঝলাম, অদূরেই মরুভূমি। দ্বিপ্রহরে রোদ যখন সাদা রং ধারণ করেছিল—তখন পরিশ্রান্ত হ'য়ে কাচ্‌রা-সিরিন নামক একটি শহরে পৌঁছলাম। শহরটি ইরানের অন্তর্ভুক্ত ; কিন্তু আরবের গন্ধ তাতে এসে লেগেছে। একটি আরব হোটেলে গিয়ে উঠলাম। হোটেলখানা ভদ্রলোকদের বাসের অনুপযুক্ত, কারণ এ হোটেলে প্রায়ই আরব এবং কুর্দ চাষারা এসে বাস করে। হোটলের মালিক আমাকে বুঝিয়ে বল্‌ল, এ হোটেলে কোন ভদ্র লোক এসে বাস করেন না, বিদেশীদের কথা ত' উঠতেই পারে না। তবুও যদি আমি থাকতে চাই, তবে আমার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হবে এবং সে জন্য সময়েরও দরকার। হোটেলের মালিককে বুঝিয়ে বললাম, আমি মোটেই ভদ্রলোক নই। আমিও একজন দরিদ্র হিন্দি, অতএব সংকোচ করবার কিছুই নাই। হোটেলের মালিক আমাকে আর কিছু না বলে একখানা রুম—যাকে আরবী ভাষায় বলা হয় 'কামরা" দেখিয়ে বল্‌ল, "আফেন্দি", বাইরে যাবার সময় রুমের তালা বন্ধ করে যাবেন, নতুবা কোন অভদ্র লোক আপনার জিনিষ উলট-পালট করতে পারে। কথাটা বেশ ভাল করেই বুঝলাম। বিদেশে গেলে এরূপ ইংগিতেই যথেষ্ট উপকার হয়। বিদেশে গিয়ে বারবার "কেন" বলতে নেই, আক্কেল খাটিয়ে কথা বুঝতে হয়।

স্নানাগারে গিয়ে শীতল জলে স্নান করে এসে আরবের সজ্জিত বিছানা পরীক্ষা করলাম। তুলার নরম একখানা তোষক এবং তারই উপর মোটা খদ্দরের চাদর বিছানো ছিল। দু'টা বালিশ তুলারই, তবে সেই বালিশে মাথা রাখলে মোটেই গরম লাগে না, কারণ বালিশের ঢাকুনি বেশ মোটা খদ্দরের ছিল। খদ্দর গরমে শীতল আর শীতে গরম থাকে। তা দেখেও আমি সন্তুষ্ট হলাম না। একেবারে বিছানা উল্‌টিয়ে চারপাইখানাও পরীক্ষা করতে লাগলাম। আরবের হোটেলে চারপাই-এর বাহাদুরী ছিল। ভেড়ার লোমের রশি দিয়ে করা হয়েছিল চারপাই এবং ঠিক মধ্যস্থলে একটি পদ্ম বোনা ছিল। আর দেখার কিছুই ছিল না। বিছানা পেতে ভাল পোষাক পরে নিকটস্থ খাবারের দোকানে গিয়ে কিছু খেয়ে এসে শুয়ে পড়লাম। শোবামাত্রই চোখের পাতা বুজে এল।

অনেক দিন পূর্বে আরব দেশ বেড়িয়ে এসে আজ আমি সে দেশ সম্বন্ধে ভ্রমণকাহিনী লিখছি। ১৯৩৪সালের কথা। তবে আমার মনে হয়, ভ্রমণ-কাহিনী পুরাতন হয় না। আজও কাচরা-সিরিনের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি-না জানি না। আজও বোধ হয় এ শহরে "স্পাইং এবং কাউন্টার স্পাইং" চলছে, আজও বোধ হয় রাষ্ট্রনৈতিকদের নির্জনের বাসস্থান বলে কাচরা-সিরিনের নাম সুপরিচিত। এ সম্বন্ধে আরও বলার ছিল। তবে কাচরা-সিরিন আরব দেশের বাইরে বলেই এ শহরটির সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলা হল না।

হোটেলওয়ালা বড়ই দয়ালু। সে বুঝে গিয়েছে, আমি মামুলী মানুষ আর মামুলী মুসাফির। তবে আমি হিন্দি বলেই বোধ হয় একটু জাতক্রোধ। আজ স্বদেশে শুনতে পাচ্ছি অনেকগুলি "স্থান" তৈরী হবে, কিন্তু হিন্দুস্থানের "হিন্দি"কে বলছি, তুমি যে ধর্মের লোক হও, ভেবনা বিদেশে গিয়ে ধর্মের মারফতে কোন সহানুভূতি পাবে। মনে রেখো তুমি শুধু হিন্দি। আরব দেশে আমাদের হিন্দি বলেই বলা হয়।

মাত্র শুয়েছি এমন সময় কে দরজায় আঘাত করল। আমি দ্বার খুলে দিলাম এবং দেখলাম দুজন সাদা পোষাকী পুলিশ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তারা তাদের পরিচয় দিয়ে আমার রুমে প্রবেশ করল এবং আমার পুঁটলীটা বেশ করে খানাতল্লাস করল, পাশপোর্টের নম্বর নিল, তারপর বেরিয়ে গেল। আমি শূন্য মনে বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলাম—এটা কি আমার দরিদ্রতার দোষ, না আমি যে একজন ভারতবাসী তার দোষ,—কোন্‌টা ?

কাচরা-সিরিন ছোট শহর। বিকালে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। বেশী কিছু দেখার না থাকায় হোটেলে এসে শরীরটা আবার মুছে নিয়ে একটী রেঁস্তোরায় গিয়ে বসলাম। রেঁস্তোরায় নানা রকম লোকের সমাগম হয়েছে। ইরাকী এবং ইরানীদের সংখ্যাই বেশি। সকলেই ইউরোপীয় পোষাকে আবৃত। গরমে কষ্ট না পাওয়ার জন্য আমরা কাপড় কম ব্যবহার করি, কিন্তু এদেশে সকলেই মার্জ্জিত পোষাকে থাকতে চায় এবং রেঁস্তোরায় প্রত্যেকেরই পোষাক মার্জ্জিত ছিল।

রেঁস্তোরায় যাঁরা বসে ছিল, তাঁরা সকলেই বিদেশী ভাষায় কথা বলার জন্য তাঁদের কথা বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল না। ইংলিশ, ফ্রেনচ এবং জার্মান ভাষাই হল রেঁস্তোরার ভাষা। রাষ্ট্রনীতি নিয়েই কথা হচ্ছিল। কথার বিষয়বস্তু শুনে মনে হল, এঁদের মাঝে রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে অনেক বহুদর্শিতা আছে। আমাদের দেশে কোন রেঁস্তোরায় কেন, শিক্ষিত-সমাজেও এরূপ উচ্চাংগের রাষ্ট্রনৈতিক কথাবার্তা অতি কমই শুনেছি। আমাদের এরূপ ত্রুটী হবার একমাত্র কারণ হল—আমরা রাষ্ট্রনীতিকে নিজস্ব ক'রে তুলতে পারিনা। রাষ্ট্রনীতি যখন নিজস্ব হবে, তখন বকাবকি কমে গিয়ে কাজের দিকে মন যাবে।

কাচরা-সিরিন্ হতে খানাকিন্ বেশী দূরে ছিল না। ইরানের সীমান্ত পর্যন্ত পথটা যদিও বিশ্রী ছিল, তবুও আরব বেদুইন (যে সকল আরব উটের পিঠে করে সওদা নিয়ে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে

ব্যবসা করে) যাতে ক'রে ইরানের সীমান্তে এসে তাঁবু না ফেলতে পারে সেজন্য ইরানী পুলিশ সন্ত্রস্ত ছিল। ইরানের সীমান্ত পার হবার পরই আরম্ভ হল পিচ-দেওয়া ভাল পথ। পথের দুদিকে দিগন্তব্যাপী অনন্ত বালুরাশি ধূ-ধূ করছিল। আমার চোখে ঠাণ্ডা চশমা থাকায় প্রখর সূর্যকিরণ অথবা উত্তপ্ত বালু এসে কোন রূপ কষ্টের সৃষ্টি করতে পারছিল না।

কতক্ষণ যাবার পরই পথের পাশে একটি আরব পরিবারকে বসা দেখে ইচ্ছা হ'ল এদের সংগে একটু পরিচয় করে নিই। সাইকেল হ'তে নেমে তাদের কাছে গেলাম এবং আমাদের নিয়ম মত নমস্কার করলাম। কারো বাড়িতে ডাকাত পড়লে লোক যেমন ভীত হয়, আমার নমস্কার পাবার পরই এই দরিদ্র আরব পরিবার অনুরূপ ভীত হল এবং তৎক্ষণাৎ তাদের সঞ্চিত খাদ্য আমাকে খেতে দিল। আমি ভাবলাম, এরা দয়া প্রকাশ করছে। খাবার খেয়ে যখন ফিরে আসব, তখন আবার নমস্কার জানালাম, তখন তারা আরও ভীত হল এবং গোপনে রক্ষিত কয়টি তামার পয়সা আমার হাতে দিল।

খানাকিন্ অতি কাছে। শহর থেকে পিতাপুত্র বোধ হয় সওদা করে ফিরছিল, এমনি সময় আমি সাইকেল হ'তে নেমে 'রফিক' বলে সম্বোধন করে পিতাকে নমস্কার দিয়ে শহর আর কতদূর হবে জিজ্ঞাসা করলাম। এতে উভয়ের মুখ ছোট হয়ে গেল। পিতাকে বিপদ হতে উদ্ধার করার জন্য পুত্র নিজের গলার মাদুলীটা ছিঁড়ে তাতে যে রূপাটুকু ছিল তাই আমার হাতে দিল।

আর দান গ্রহণ করতে পারলাম না। শরীর কেঁপে উঠল। বুক দুর দুর করতে লাগল। এটা মরণভয় নয়, পাপের ভয়। যে কাজে সমাজের ক্ষতি হয়, তাকেই আমি পাপ বলি। হয়ত আমি এমন কিছু করেছি, যাতে আরব সমাজের ক্ষতি হয়েছে, নতুবা আমার মনটা এত দুর্বল হবে কেন?

সূর্য অস্তমিত হয়েছে। পশ্চিমের আকাশ তখন লোহিতাভ রয়েছে। আমি শহরে এসেছি, কিন্তু সন্ধ্যার আজান শুনতে না পেয়ে মনে হ'ল, হয়ত এ গ্রামে মুসলমান আরব বাস করে না, খৃষ্টান নয়ত আসিরিয়ানরা বাস করে। যেই বাস করুক, রাত কাটানই আমার উদ্দেশ্য। গ্রামে পৌঁছে একটি কাফেতে প্রবেশ করলাম। কাফের মালিক একজন মুসলমান। লোকটি দয়ালু বলেই মনে হল। কিন্তু অদূরে কয়েক জন ভিন্ন পোষাকে আবৃত লোক আমার আগমন মোটেই পছন্দ করছিল না।

কাফের মালিক ইংলিশ বলতে পারতেন। তিনি আমাকে বসিয়েই বললেন—"আপনি বোধ হয় ভূপর্যটক।" আমি বললাম "হ্যাঁ, বন্ধু!" আর কিছু না বলে দোকানী আমার সামনে এক পেয়ালা কাফি দিয়ে বললেন, "এই খান, আমি একটু আসছি।"

বুঝলাম এ যাওয়ার মানে কি হতে পারে। মাথা নত করে ভাবছিলাম অনেক কথাই। তারপর ঠিক করলাম, আজ মুখ খুলে কথা বলব, এতে দুঃখ আসে আসুক, সে দুঃখ বরণ করে নিতে হবেই। কাফের মালিক ফিরে এসে বললেন, "নিকটেই রেল-ষ্টেশন এবং ষ্টেশন-মাষ্টার একজন হিন্দি। তার সংগে আপনার থাকা ভাল হবে।" আমি আরব ভদ্রলোককে বললাম, "যদি আমি আমার স্বদেশবাসীর কাছে গিয়ে রাত কাটাই, তবে আপনাদের কথা কিছুই জানা হবে না। হিন্দি ষ্টেশন-মাষ্টার আপনাদের সম্বন্ধে হয়ত একটা বদ ধারণাই আমার মনে পোষণ করিয়ে দেবেন, তাতে আপনাদের যেমন ক্ষতি হবে, আমারও তেমনি ক্ষতি হবে। আমি স্বাধীনভাবেই আপনাদের দেশে এসেছি। আমি সরকারী চাকর নই। আমাকে সাহায্য করা আপনাদের কর্তব্য।" দোকানী আর কিছুই বললেন না। তিনি ঘরের পেছনে চলে গেলেন এবং কতক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন—তাঁরা রাত্রে বাইরে শোন এবং আমাকেও বাইরে শুতে হবে। আমি তাতেই রাজি হলাম। আরব দোকানী

আমাকে অতিথি বলে স্বীকার করলেন। আরব প্রথামতে যদি কাউকে অতিথি বলে স্বীকার করা হয়, তবে করমর্দন এবং আলিংগন করতে হয়। আমার সংগেও আরব দোকানী তাই করলেন।

সাইকেলটা টেনে ঘরের পেছনে নিয়ে গেলাম। তারপর তিনি এক বদ্‌না জল আমাকে মুখহাত ধুইবার জন্য দিলেন। আমি আমাদের প্রথায় হাত পা ধুয়ে আরব প্রথা পালন করতে বাধ্য হলাম, কারণ যে জলটুকু দিয়েছিলেন তা অতি সামান্য। সর্বপ্রথম হাত ধুয়ে ফেললাম, কারণ হাতে অনেক ধূলা লেগে রয়েছিল। তার পরই নাক, মুখ, চোখ, কান এবং ঘাড়টা জল দিয়ে মুছে মাথাটাতে একটু জল দিলাম, এতে শরীর বেশ স্নিগ্ধ হল। অবশিষ্ট জল দিয়ে পা ধুইলাম। আমার শরীরের ভিতরে এবং বাইরে শান্তির আস্বাদ পেয়ে গেলাম।

আরব দেশে খালি পায়ে থাকা বড়ই নিন্দনীয়, তাই ফের মোজা এবং জুতা পরে নিলাম। এদিকে আবার ইউরোপীয় সভ্যতা এসে দেখা দিয়েছে। পুরানো প্রথা কেউ পছন্দ করে না। পুরানো প্রথা পছন্দ না করবার নানা কারণও আছে। আমাদের দেশ হতে মহাযুদ্ধের সময় অনেক সেপাই আরবে গিয়েছিল, তাদের আচার-ব্যবহার আরবগণ নানা কারণেই পছন্দ করত না এবং যখনই কোন আরবকে অন্য আরব তর্কে পরাজিত করতে পারত না, তখন ভারত-বাসীর প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করত।

খানাকিন একটী ছোট শহর। তার চারদিকে অনন্ত বালুকা ধূ ধূ করছে। খানাকিনে সুমিষ্ট জলের অভাব না থাকায় ছোট শহরটি ক্রমেই বর্ধিত হ'চ্ছিল। শহরের মাঝে এবং বাইরে খেজুর-বাগান থাকায় গরমের আধিক্যও তত ছিল না।

ছোট কাফেখানা ইউরোপীয় ধরণে সাজানো। তাতে টেবিল চেয়ার ছিল, এবং দেওয়ালে নানারূপ ছবি আটকান ছিল। ছবিগুলি বিশেষ অনুধাবন করে দেখতে লাগলাম। রাজা ফৈজলের ছবি বিশিষ্ট

স্থানে রক্ষিত ছিল। তারপরই ইব্নে সউদ্-এর ছবি বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। এ ছাড়া যে সকল ছবি রক্ষিত ছিল, তা মামুলী ধরণে সাজানো। প্রেসিডেন্ট হুবার, নেপোলিয়ান, জহরলাল, রেজাশা পহ্লবী, হিটলার, দুটি জাপানী মেয়েলোক, বোম্বের কটন মিলের মালিক, এবং অন্যান্য মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা হ'তে কেটে অনেক ছবি দেওয়ালে চাপকেও দেওয়া হয়েছিল।

কতক্ষণ পর কাফের মালিককে বল্লাম, যদি স্নানের একটু বন্দোবস্ত করেন তবে বড়ই বাধিত হব। স্নানের কথা শুনেই মালিকের যেন মুখ শুকিয়ে গেল। আমি তাঁর মনের অবস্থা বুঝেই বল্লাম, "নট বাথ্ওনলি ওয়াস"। দোকানী বল্লেন, "ও ইয়েস্ ওয়াস্"। তৎক্ষণাৎ এক বদনা জল এনে হাজির করলেন। আমি আরবী প্রথায় উজু করে নিলাম। বুঝলাম, জলাভাবের জন্যই আরবরা মাথার চুল ছোট করে কাটে। মাথায় চুল কম থাকলে মাথাটা সামান্য জলে ধুতে কষ্ট পেতে হয় না। বাস্তবিকই আমরা যেমন প্রথম পা ধুই--তা হল জলের প্রাচুর্যের লক্ষণ। কিন্তু যদি জল কম থাকে তবে কি কেউ পা ধুতে সাহস করবে? মরুভূমিতে সাধারণতঃ নাকের ভেতর ধূলা গিয়ে ঢুকে। তা পরিষ্কার না করলে নাকটা চটচট করে। কানের অবস্থাও তাই হয়। নাক, কান, চোখ, এবং মুখ ধুয়ে, তারপর ঘাড় ধুলে, শরীর আপনি স্নিগ্ধ হয়। আরবের লোক কেন যে উজু করে তা মরুভূমিতে না গেলে পুরাপুরি ভাবে অনুভব করতে পারা যায় না। আমি আরব দেশে থাকার সময় চুরি করে জলও খেয়েছি। আমাদের দেশে বোধ হয় আজ পর্যন্ত কেউ জল চুরি করে খায়নি।

উজু করে গিয়ে কাফেতে বসার পরই একটি যুবক আর এক পেয়ালা সুমিষ্ট কাফি আমাকে এনে দিল। সুমিষ্ট সুস্বাদু কাফি এজীবনে এই প্রথম খেতে পেয়ে সুখী হলাম। তাতে দুধ ছিল না। ছিল খেজুরের পাতলা রসের সংগে কাফির আরক। ধীরে ধীরে তাই খেতে লাগলাম। মাঝে মাঝে ইরাকী সিগারেটও টানতে

লাগলাম। আমার মত অনেক ভারতবাসী এসেছেন বটে, কিন্তু সাইকেলে করে কেউ আসেনি বলেই আমার প্রতি এত আদর। ভূপর্যটককে কিরূপ আদর-যত্ন করতে হয়, আরবগণ বেশ ভাল করেই জানে।

কাফের মালিক আমার কাছেই বসেছিলেন, তিনিও কাফি খাচ্ছিলেন। আমি তার মনের শান্তভাব দেখে বল্লাম, "মহাশয় আমাদের নিয়ম হল হাতজোড় করে নমস্কার করা" এবং কি করে নমস্কার করা হয় তাও দেখালাম। তারপর বল্লাম, "এরূপ করে নমস্কার করায় অনেক আরব তাদের যথাসর্বস্ব আমাকে দিয়ে দিয়েছে, এরূপ করা কি অন্যায়?" কাফের মালিক হেসে বললেন, "আমাদের নিয়ম হলো আল্লা ছাড়া কারো কাছে মাথা নত না করা। কারো কাছে যদি কিছু চাইতে হয় তবে তাকে দুহাত পেতে তাঁরই কাছে চাইতে হবে। যখনই কোন আরব দুহাত জোড় করে কারো কাছে কিছু চায়, তৎক্ষণাৎ তাকে তাই দিতে হয়। হাত জোড় করে ভিক্ষা চাওয়া আর নিজের ঘাড়ে নিজে তলওয়ার মারা একই কথা।" একথা শোনার পর কোন আরবকে নমস্কার এমন কি কোন রকমের অভিবাদনও করিনি।

জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে নিয়ে চুপ করে কাফি খেতে লাগলাম। কতক্ষণ পর কতকগুলি রুটি ও কয়েক টুকরা মাংস এল এবং তা' প্রত্যেককে দেওয়া হল। প্রত্যেকে আপন মনে কি মন্ত্র পাঠ করল, তারপর খেতে সুরু করল। আমি কোন রূপ মন্ত্র পাঠ না করেই খেতে সুরু করলাম। আমাকে সেজন্য কেউ কিছু বলেনি। আপন মনে খাবার সমাপ্ত করে সবাই হাত ধুয়ে ফেলল। কিন্তু একবার যা খেতে দেওয়া হয়েছিল, দ্বিতীয় বার তা দেওয়া হল না। সত্য কথা বলতে কি এই সামান্য খাবার খেয়ে আমার তৃপ্তি মোটেই হয়নি। এরূপ খাদ্য আর পাঁচ বার খেলেও আমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হতো না। কিন্তু কেউ আর চাইল না বলে আমিও চাইতে সাহস

করলাম না। খাবার সমাপ্ত করে প্রত্যেকেই জল দিয়ে পেট ভর্তি করতে লাগল। আমিও তাই করলাম। আরবদেশে যেমন খাদ্যের মূল্য আছে, তেমন জলেরও মূল্য আছে। আমরা খাবারের শেষভাগে যেমন নানারূপ মিষ্ট, দই বা ঘন দুধ খাই, আরবদেশে তার বদলে জলের ব্যবস্থা রয়েছে। পেট ভরে জল খাবার পর ফের কাফি এল। সবাই কাফি খেতে লাগল। আমিও তা হ'তে বাদ পড়লাম না।

খাওয়া হয়ে গেলে অনেকেই নামাজ পড়তে উঠে গেলেন। যাঁরা নামাজে গেলেন না, তাঁরা ঘরের পেছনে সজ্জিত বিছানার দিকে চললেন। আমি কোথাও গেলাম না, বসেই রইলাম। কতক্ষণ পর দোকানী বললেন—আপনাদের দেশ হ'তে যে সকল লোক এ দেশে চাকুরি করতে আসে, তারা কি রকমের লোক ?

এবার বুঝতে আর বাকী রইল না। আমাদের দেশের যে সকল লোক ইরাকে চাকুরি করতে গিয়েছে, তাদের কারো প্রতি আরবগণ সন্তুষ্ট নয়। আমাদের দেশের লোক চাকুরি পাবার পর, সে যে একটি বেতনভোগী লোক সে কথা ভুলে গিয়ে অপরের উপর নির্যাতন করতে আরম্ভ করে। ইরাকে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মাঝে সেরূপ লোকের অভাব ছিলনা বলেই কথাটা উঠেছিল। আমি অতি সংক্ষেপে দোকানীকে বললাম—ক্ষমা করবেন বন্ধু, আপনার জানা উচিত আমরা পরাধীন। পরাধীনের নানা দোষ। আমরা যদি স্বাধীন হতাম তবে আপনি এরূপ প্রশ্ন করতে পারতেন না। দোকানী আমার কথা শুনে তৎক্ষণাৎ আমাকে আলিংগন করলেন এবং বললেন—আজ আমি একজন আসল হিন্দিকে অতিথিরূপে পেয়েছি।

বাগদাদের পথে

পরের দিন বের হবার পূর্বে বাগদাদের পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করলাম। আরবগণ আমাদের মত "এগিয়ে যান" বলে না। তাদের কথার মূল্য আছে এবং আমাদের দেশে যারা বলে 'ঐ সামনেই', তাদের মত দায়িত্বজ্ঞানহীনও নয়। আমার পথের সন্ধানের সঠিক সংবাদ জানার জন্য বেশ এক সভা বসে গেল। অনেকেই উটের পথ জানে, মোটর রোডের সংবাদ অতি অল্প আরবই রাখে। একটি আরব বল্ল, "পথে অনেক সময় ধূলা এসে জমা হয় এবং সেই ধূলার উপর মোটর পিছলিয়ে যায়, সাইকেলেও সেরূপ পিছলানোর সম্ভাবনা আছে।"

কথাপ্রসংগে জিজ্ঞাসা করলাম, "পথে বেদুইন ডাকাতের আক্রমণের সম্ভাবনা আছে কি?" আমার কথা শুনে অনেকেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। একজন বলল, "পর্যটক! মরণকে ভয় কর কেন? কোন পর্যটক মরণের ভয় করে না।" কথাটা শুনে বাস্তবিকই দুঃখ হয়েছিল। কত ইউরোপীয় পর্যটক আরবদেশে একাকী ভ্রমণ করেছে, কতজন মৃত্যুকে আলিংগন করেছে তার ইয়ত্তা নেই, আর আমার ভীত হবার কারণ কি? কথাটা চিন্তা করে বড়ই দুঃখ হল। আর দাঁড়ালাম না, এক হাত উঠিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম এবং শুধু দোকানীকে আলিংগন করে পথে বেরিয়ে এলাম।

আরব্য রজনী নয়, আরব্য দিবা। পথ ভালই। যেদিকে চাইছি সেইদিকেই বালুকণা ধূধূ করছে। ইচ্ছা হয় গ্রামে ফিরে যাই। গ্রামটা যেন আমার জন্মভূমি, পেছন হতে যেন আমাকে ডাকছে। পথে লোক নাই, একজনও না, একটা উটও না। মনে হচ্ছিল, যদি

একটা বাঘ দেখি, তবুও ভাল হ'ত, তবুও শান্তি পাব। আমি জীব। জীবনের দর্শন চাই, সে শত্রুই হোক আর মিত্রই হোক। কিন্তু কোথায় জীব, কোথায় জল? জলের কেতলী হতে জল চুইয়ে পড়ে কিনা তাই বার বার পরীক্ষা করতে লাগলাম। এটা যেন আমার "ম্যানিয়া" হয়ে পড়ল। শুধু জলের কথাই মনে হতে লাগল। চুদিকে রাশি রাশি বালুকণা, উপরের আকাশের দিকে চাইতেও ভাল লাগল না। অতি পরিষ্কার সে আকাশ। আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন আকাশের শেষ সীমা পর্যন্ত দেখ্‌ছি। গভীর সাগরে—যেখানে স্বচ্ছ এবং গাঢ় নীল জল দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে যেমন কুড়ি পঁচিশ হাত জলের নীচে কি আছে খালি চোখে দেখা যায়, তেমনি আরবের আকাশের শেষ সীমাও যেন দেখা যায়। এসব কথা যেমন করে ভাবছিলাম, তেমনি ভাবছিলাম,—ঐ যে গ্রামখানা পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল তা গেল কোথায়? কুক যেমন পৃথিবীর গোলত্ব সাগরের জলে জাহাজের মাস্তুলের অগ্রভাগ দেখে ঠিক করেছিলেন, আমাদের দেশের লোক কেন আরব গ্রামের খেজুর গাছের অগ্রভাগ দেখে বলেনি—পৃথিবী গোল? আমার রাগ হল পূর্বদেশের পুরাতন লোকের প্রতি।

রাগ হবার কথাই। আমাদের দেশের লোকের সাধারণ বুদ্ধির অভাব ছিল কিনা তাই নিয়ে ভাবতে লাগ্‌লাম। সেই কথাই ভাবছিলাম আর সাইকেল চালিয়ে চল্‌ছিলাম। ভাবছিলাম কিসের জন্য তা বোধ হয় অনেকে বুঝতে পারছেন না। সামনে বালু, পেছনে বালু আর উপরে গাঢ় নীল আকাশ। চিন্তা করা ছাড়া আর কি কাজ করতে পারা যায়? যাকে আমরা মন বলি সেটা ত নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকতে চায় না, এবং আমি ভেকও নই যে উর্ধরেতা হয়ে সুধা পান করব।

ঐ দেখা যাচ্ছে খেজুর গাছের অগ্রভাগ। নিশ্চয়ই ভুল হবে। আমি এখন কলম্বস, সমুদ্রযাত্রা করেছি হিন্দুস্থান আবিষ্কার করতে।

আমার খুব আনন্দ। ঐ খেজুর গাছের পাতা, তারপর খেজুরের গুচ্ছ। কত সুমিষ্ট ফল। সে ফল জীবন বাঁচায়। খেজুর গাছের নীচে নিশ্চয়ই কুয়া আছে। সে কুয়ার জল নিশ্চয়ই মিষ্ট, স্বচ্ছ, সুন্দর, জীবনে ভর্তি। সে জল পান করে জীবন ফিরে পাব। সামনে গ্রাম। কত সুন্দর সে গ্রাম। গ্রামে গৃহ। গৃহে লোক আছে। লোকে নিশ্চয়ই খাবারের দোকান করছে, সেখান হতে খাবার কিনে খাব। ঘরে গিয়ে বসব। নিশ্চয়ই শীতল বায়ু বইছে, সেই ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর ঠাণ্ডা হবে, আরাম হবে, শান্তি পাব। ঐ গাইছে মোল্লা ভগবানের গুণগান। নিশ্চয়ই ভগবান আছেন। জল তাঁরই সৃষ্ট, রুটি তাঁরই সৃষ্ট, গ্রাম এবং খেজুর গাছ তাঁরই সৃষ্ট। এরূপ চিন্তাধারার ভেতর দিয়ে গ্রামে পৌছলাম।

উদগ্রীবতা কত তা অনুভব না করলে ভাষায় বুঝান যায় না। কাঁটা দিয়ে কাঁটা উঠাতে হয়। কথা দিয়ে কথা বলিতে হয়, ভাব দিয়ে ভাবকে দূর করতে হয়। মনে হলো তিন দিনের উপবাসী ভুবন সন্ন্যাসীর কথা। তিন দিন পর যখন অন্ন পাক করছিল ভুবন সন্ন্যাসী এবং তার মন খাব-খাব করছিল, তখন বিকারের তাড়নায় ভুবন সন্ন্যাসী পদাঘাতে হাঁড়ি দূরে ফেলে দিয়েছিল। আমিও মনের দুর্বলতার সৃষ্ট ভগবান, এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে পদাঘাত করে তাড়িয়ে দিয়ে রৌদ্রের মাঝে বসে পড়লাম। কে তোর ভগবান? এখানে এই হল আমার আদেশ আমার প্রভি। যাবনা গ্রামে। মন থর থর করে কাঁপতে লাগল, কি জানি দেহের অবসানের সংগে সংগে তারও শেষ হয়।

রৌদ্রে শরীর জ্বলছিল, শরীরের চামড়ায় ফোস্‌কা পড়বার মত হয়েছিল, কারণ সাইকেলের উপর থাকার দরুন একটু বাতাস পেয়ে ছিলাম, তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আরও গরম লাগছিল। মনের উত্তালতা কমল, মন হার মানল; তারপর আমি ধীরে ধীরে গ্রামে গিয়ে পৌছলাম। গ্রাম নীরব নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে দু'একটী লোক

গাধার উপর বসে, এবং গাধা তাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল। কাউকে কোনরূপ অভিবাদন জানালাম না; শুধু চেয়ে দেখতে লাগলাম গ্রামের কোথাও শহরের গন্ধ আছে কিনা?

সামনেই একখানা বইএর দোকান দেখতে পেয়ে আনন্দ হল। তাতে আরবী অক্ষরে লেখা নানারূপ সংবাদপত্র রক্ষিত ছিল। দু'এক খানা ফ্রেন্চ ভাষার বইও ছিল। দোকানী আমার সংগে ফ্রেন্চ ভাষায় কথা বলল। আমি বললাম, "উর্দু ফামিদী?" অর্থাৎ হিন্দুস্থানী বুঝ কি না? দোকানী বললে, "নাই"। আমি বল্‌লাম, "মন ইরানী ফামিদম অর্থাৎ আমি ইরানী ভাষা জানি।" নিজের দরকার অনুযায়ী ইরানে থাকার সময় কতকগুলি ইরানী কথা শিখেছিলাম তাঁরই যে দু'চার কথা মনে ছিল তাই দিয়ে কথা সুরু করলাম। পথিকের চাই কি? সর্বপ্রথম বিশ্রাম। লোকটি তা বুঝতে পেরে নিকটস্থ সরাই দেখিয়ে বলল, "পাকতি ইসি রুই" অর্থাৎ এই পথ দিয়ে চলে যাও। একটু এগিয়ে গিয়েই একটা মেটে ঘরের কাছে এসে দেখলাম, কতকগুলি লোক বসে রয়েছে। ইংলিশে বললাম, এটা কি সরাই। একজন লোক বলল, হাঁ এটা সরাই, যদি থাকতে চান ত আসুন। আমি সাইকেলটা বাইরে রেখে যে লোকটি কথা বলেছিল তারই গালিচাতে গিয়ে বসলাম এবং কোথায় জল পাব তাই জিজ্ঞাসা করলাম। লোকটি তৎক্ষণাৎ একটি লোককে জল এনে দিতে বলল। আমি নীরবে জলের অপেক্ষা করতে লাগলাম। একবারও হুঁ হাঁ কোন রূপ শব্দ করলাম না, তারপর জল যখন এল, তখন ভাল করে উজু করে নিয়ে ফের গালিচায় বসে একটি ছোট কাপে এক কাপ জল ধীরে ধীরে চায়ের মত খেয়ে শুয়ে পড়লাম। পরিশ্রমের পর নিদ্রা এল, আমি গরমকে ফাঁকি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম থেকে উঠে ফের জল আনিয়ে উজু করে কাফি আনতে বললাম। কাফি আনিয়ে দিলেন পরিচিত লোকটি। আমাকে

সেজন্য একটা পয়সাও দিতে হল না। তারপর উভয়ে মিলে খাবার আনিয়ে পেট বোঝাই করে খেয়ে নিলাম। খাওয়া বড়ই আরামের হয়েছিল। দুম্বার মাংসের কাবাব আর আরবী রুটি। খাবারের পর কতকগুলি ফলও খেয়েছিলাম। আমার প্রচুর ভোজন দেখে ভদ্রলোকের তাক লেগে গেল। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এর চেয়েও বেশী খেতে পারেন কি?" আমি বললাম, "নিশ্চয়ই, বন্ধু"। আরবগণ খুব কম খেয়ে থাকে বলেই আমার খাওয়া দেখে ভদ্রলোক আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। ইংলিশ জানা একজন আরব পেয়ে আমার মনে কত আনন্দ হয়েছিল তা বলবার নয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জান্‌লাম, তিনি এ গ্রামে তিন দিন থাকবেন, তারপর যাবেন বাগদাদ্। সোজা যাবেন না, গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ঘুরে যাবেন। আমি তার সংগী হতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি আমাকে বললেন, "আমার সংগে যদি আসতে চান তবে পাঁচ মাইল দূরে এখান থেকে রেলপথ আছে, সেখানে গিয়ে সাইকেলটা বাগদাদে বুক করে দিন এবং আমার সংগে উটে করে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে চলতে থাকুন।" আমি তাতেই রাজি হলাম। কিন্তু কথা হলো এত টাকা পাই কোথায়? আরব ভদ্রলোক কারপেট এবং জাপানী খদ্দরের ব্যবসা করতেন। যে মুহূর্তে আমি তাঁর কথায় রাজি হলাম, তৎক্ষণাৎ তিনি বয়কে বলে আমার জন্য নূতন একটা কারপেট খুলে দিতে বল্‌লেন এবং তারই উপর বয় বিছানা সাজিয়ে দিল। আমাকে সওদাগর বল্‌লেন, "বন্ধু, এখন আপনি আমার অতিথি, আপনার নাম বলুন।" আমি বল্লাম, "আমার নাম রামনাথ বিন বিরজানাথ, জাতে হিন্দি, ধর্মে বিরজানাথ হিন্দু অতএব আমিও তাই।" তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি?" ভদ্রলোক বল্‌লেন, "আমার নাম আবদুল্লা বিন হানিফ। হানিফ ধর্মে ইসলামী, তাই আমিও ইসলামী।" অতএব উভয়েই আমরা পিতৃধর্মের অনুগামী। পিতা

যদি চোর হতেন ; তবে আমরাও চোর হতাম। অবশ্য কথাটা খুলে বলিনি।

আমার বিছানা হয়ে যাবার পর বিছানায় বসে সিগারেট ফুঁকতে লাগলাম এবং চিন্তা করতে লাগলাম, বিকালে একবার গ্রামটা দেখে নিতে হবে। কিন্তু আরবের অতিথি হওয়া বড়ই কষ্টকর কাজ, কোথাও যেতে হলে বলে যেতে হয়। সালাম আলায়কুমের ব্যবহার খুবই কম দেখলাম। যখন কেউ বিদায় নেয়, তখন বলা হয়, "এখন যাই, আবার দেখা হবে।" যিনি বিদায় দেন তিনি বলেন, "নির্বিঘ্নে ফিরে এস।" আমার এসব কথা মোটেই মনে থাক্‌ত না, তাই কিছুই বলতাম না।

বিকালে আবদুল্লা বিন হানিফ আমাকে সরাইখানার সকলের সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার পরিচয় হবার পর ওরা আমাকে হিন্দুধর্ম কি তাই জিজ্ঞাসা করল। আমি যা বলে গেলুম মিঃ আবদুল্লা তাই তাদের বল্‌তে লাগলেন। আমি বলেছিলাম, হিন্দুধর্মের মাঝে একেশ্বরবাদ, পৌত্তলিকতা এবং নাস্তিকতা সবই আছে। প্রত্যেকে ইচ্ছামত ভগবানের স্বরূপ নির্ণয় করতে পারবে। এই হল হিন্দুধর্মের মোট কথা। কিন্তু আমি এসবের কিছু ধার ধারি না। অতএব বন্ধুগণ, আমার সত্য কথার বলার জন্য কেউ আমার প্রতি রাগ করবেন না। ধর্ম সম্পর্কে কেন, যে কোন বিষয়ে আরবদের কাছে কথা বলতে হলে ভূমিকা করতে নেই, সোজা কথায় বিষয় বুঝিয়ে দিতে পারলেই হ'ল। আমার কথা শুনে আবদুল্লা তৎক্ষণাৎ আমাকে ফিলসফার উপাধি দিয়ে আপ্যায়িত করলেন।

আরব গ্রামে তিনটা দিন বেশ ভালই কেটেছিল। গ্রামের লোক রাষ্ট্রনীতি নিয়ে কথা বলতে বড়ই ভালবাসত। এতে ফল ভালই হয়। আনাড়ী লোকও নানা কথা অপরের কাছ থেকে শুনে অনেক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়। আমাদের পরাধীনতা আমরা সকল

সময় অনুভব করতে পারি না, এমন কি অনেক সময় তা ভুলেই যাই, আরবগণ কিন্তু তাদের স্বাধীনতার সম্বন্ধে সকল সময়ই সচেতন। আরবগণ যে পরাধীন সে কথাটি প্রত্যেকেই জানত এবং তা অনুভবও করত।

আরব যাযাবর জাত। এক স্থানে বেশী দিন থাকতে ভালবাসে না। আরবগণ যাযাবর হয়েছে স্বেচ্ছায় নয়, প্রাকৃতিক উপসর্গই তার একমাত্র কারণ। গত মহাযুদ্ধের পর আরব দেশটাকে নানা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক দেশের সীমান্ত পার হয়ে আরবদের বেশ বেগ পেতেও হয়। পূর্বে কিন্তু এরূপ ছিল না। আরবগণ চায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে। আরবগণ প্যান-ইস্লাম-এর ধার ধারে না। তার নানা কারণও আছে। এসব কথা পরে বলা হবে।

গ্রামে আমার মত লোকের আগমনে সবাই রাষ্ট্রনৈতিক চর্চা করছিল এবং আমি যাতে এসব কথা বুঝতে পারি তারও ব্যবস্থা করছিল। তাদের রাষ্ট্রনৈতিক কথার উপসংহারে আমি কেঁপে উঠতাম আর দেশের কথা ভাবতাম। প্রত্যেক দিন আবহুল্লাকে বলতাম, "আমার দেশের অশিক্ষিত লোককে আপনারা ক্ষমা করবেন।" আবহুল্লা বলতেন, হিন্দুস্থান হল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আড্ডাস্থল। নানা রকমের লোক হিন্দুস্থানে বাস করার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বেশ সুবিধাই হয়েছে। তারা হিন্দিতে হিন্দিতে যেমন বিবাদের সূত্রপাত করে দেয়, তেমনি অপরকে নির্যাতন করার জন্যও হিন্দিদের সাহায্য পায়! এরূপ যাতে না হয় তারই কথা আমরা আলোচনা করছিলাম, এর বেশি কিছুই নয়।

সকাল সন্ধ্যা প্রায়ই রাষ্ট্রনীতি নিয়েই কথা হতো। শুধু বিকাল বেলাতেই আমি গ্রাম দেখতে বেরিয়ে পড়তাম। তৃতীয় দিন বিকাল বেলা মনে হল, আমি আজ ঠিকই বেদুইন হয়ে গেছি। সাইকেল আমার সংগে ছিল না, পূর্বেই সাইকেল পারসেল করে বাগদাদ

পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কাল সকালে আমি বেদুইনের সংগে বেড়াতে বের হব, কত কিছু দেখব, এই ভরসায় আমি মস্‌গুল হয়ে পড়লাম।। রাষ্ট্রনীতির কথা একদম ভুলে গেলাম।

সাদা সূর্যের মুখ দেখার পূর্বেই আমরা আমাদের উটগুলি লাদাই করলাম। লাদাই শব্দটা আমাদের ভাষায় ব্যবহার করতে চাই। কারণ লাদাই করা মানেই হল উটের পিঠে মাল বোঝাই করা। এই শব্দটি আরব, ইরানী, পাঠান, তুরুক, হিন্দুস্থানী সবাই ব্যবহার করে। অতএব এই শব্দটির বাংলা ভাষায় স্থান পাওয়া সমূহ দরকার মনে করি। উট লাদাই হয়ে গেলে উটের জুথ। নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম গ্রামের বাইরে। তখনও আকাশের নক্ষত্ররাজির দীপ্তি নিভে যায়নি, তখনও শুভ্র বালুকার চকমকে আভা একটুও কমেনি। এখনও আরব মরুর শীতল স্নিগ্ধ বাতাস বইছে। আমি উটের পিঠে বসে ভাবছিলাম বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথা। তুমি আরব মরুর উটের পিঠে চড়া কল্পনা করেছিলে, আর আমি তা অনুভব করছি। সেই জন্যই বলেছিলে, "হিংসা হয় কল্পনা আর অনুভবের পার্থক্যে।" কি জানি কেন বিশ্বকবির সংগে দেখা হয়েছিল, যখনই নূতন কিছু দেখতাম তখনই মনে হত, এটা নূতন নয় এটা পুরাতন,—পুরাতন অন্ততঃ পক্ষে—একজনার কাছে।

আমাদের উট চলেছে উত্তর দিকে, বাগদাদ পশ্চিম দিকে। দিক মনে রাখার দরকার ছিল না। আমার দরকার "আরব্য রজনী" অনুভব করা। ক্রমে সূর্য পূর্বের আকাশে এসে দেখা দিল। সূর্যকে দেখামাত্রই রাগ হল। সূর্য ক্রমে একটু একটু করে উপর উঠল, আর আমাদের উট এগিয়ে চলল। দূর থেকে উটের লহরকে সমুদ্র-তীরের নারিকেল বৃক্ষ বলে অনেক সময় ভুল হয়। যেখানে শুধু উটরূপে নারিকেল বৃক্ষ এবং বালু সমুদ্র সেখানে মরীচিকা যে কি তা আর বলে দরকার নেই। সেজন্যই উটের পিঠে বসলেই চোখ ভেঙ্গে ঘুম আসত। কিন্তু সকলের ঘুম আসে না। যাদের ঘাড়ে দায়িত্ব

নাই, তাদেরই ঘুম আসে। আমি বসে বসে ঘুমাচ্ছিলাম। আমার উটটি জুথার মাঝে ছিল। সামনে এবং পেছনে জুথায় আরও উট ছিল। আমার উটের নাকের রশি অন্য উটের লেজে বাঁধা ছিল। দলভ্রষ্ট হবার মোটেই আশংকা ছিল না।

আমাদের চারদিকে বালুকারাশি ধূ ধূ করছিল। আবদুল্লা সামনের দিকে তাকিয়ে আমাদের গতি নির্দেশ করছিলেন। উটের একটা বেশ গুণ আছে। কম্পাস যেমন সর্বদাই উত্তর দিকে থাকে, উটও তেমনি জলের গন্ধ দূর হতে পায় বলেই যেদিকে জল আছে সেদিকেই চলতে থাকে। নাবিকেরা যেমন বাতাসের উল্টা দিকেও জাহাজ চালিয়ে যায়, তেমনি উটের গতিও নির্দেশ করতে হয়, নতুবা নিকটস্থ জলের কাছে গিয়ে উট আপনি হাজির হয়। তখনও দশটা বাজেনি, কিন্তু আবহাওয়া দেখে মনে হচ্ছিল যেন বেলা দুপুর হয়েছে। আরব দেশের দ্বিপ্রহর সুরু হয় বেলা ন'টা হতে এবং ক্রমাগত উত্তাপ বেড়ে সে দুপুরে ভাব চারটা পর্যন্ত থাকে। বেলা চারটার সময় হঠাৎ সূর্যকিরণের রং বদলে যায়। বিকালের দিকে সূর্যকে একটু রক্তাভ বলেই মনে হয়। মরুভূমিতে দ্বিপ্রহরে চলার ক্ষমতা সকলের থাকে না। দশটার একটু পূর্বেই আমরা একটা ছোট গ্রামে এসে পৌছলাম। গ্রামে মাটির পাঁচিলে মাত্র তিনখানা ঘর, আর কোন ঘর ছিল না; আর সবই তাঁবু। এরই মাঝে একটি মসজিদ। মস্‌জিদ সিয়া শ্রেণীর। সুন্নিরা ভুলেও সেখানে প্রবেশ করে না। গ্রামের তিনখানা ঘরের একখানা সরাই। এখানে সরাই মানে খয়রাতী ঘর নয়, বিশ্রামাগার। এখানে অর্থের বিনিময়ে বিশ্রাম করতে পারা যায়। আমরা একখানা ছোট রুম ভাড়া নিলাম। তিন শত ফিলিস সে রুমটির দৈনিক ভাড়া। তিন শত ফিলিসে তিন শিলিং হয়। আবদুল্লা তিন শিলিং দিয়েই রুমটা নিলেন। ঘরের দেওয়ালগুলি বেশ মোটা। একটি মাত্র দরজা। রুমে দিনের বেলাই অন্ধকার অনুভূত হয়। সেজন্য ঘরটা আরাম-

প্রদ। বয়রা আমাদের জন্য কারপেট বিছিয়ে দিল, তারপর উট-গুলিকে খাবার দিল। আমরা হাত-পা ধুয়ে উজু করে কারপেটে বসলাম। আমাদের সাথেরই একটি লোক একটি থলি হতে রুটি, কতকগুলি খেজুর এবং একটা বদনাতে করে এক বদনা জল এনে দিয়েই, এক এক পেয়ালা করে কাফি প্রত্যেককে খেতে দিল। আমাদের শরীর তেলে জলে বাঁধা। আমরা জলই খেতে চাই প্রথম। আরবগণ কিন্তু আমাদের মত নয়, তারা গরম কাফি খায় সর্বাগ্রে। এতে খামখেয়ালী ক্ষুধার লোপ হয়। আমরা কাফি খেয়ে উভয়েই এক টুকরা রুটি এবং দুটি করে খেজুর খেয়ে নিলাম। আবদুল্লা একটুও জল খেলেন না, আমাকে কিন্তু জল খেতে হল। আবদুল্লা আমার জল খাওয়া দেখে একটু হাসলেন এবং বললেন, হিন্দিরা জল না খেয়ে থাকতে পারে না।

সামান্য খাবার খেয়ে আমরা বিশ্রাম করতে লাগলাম। আমার তরফ থেকে কথা বলার মত কিছুই ছিল না। গরমে আমাকে কাবু করেছিল। আবদুল্লা কিন্তু চুপ করে থাকবার পাত্র নন। তিনি বার বার সোভিয়েট, বলশেভিজম্‌, ভগবান এসব নিয়েই নানা কথা উত্থাপন করিতেছিলেন। আমি হুঁা হুঁ করে তার প্রশ্নের জবাব কাটিয়ে যাচ্ছিলাম। আবদুল্লার ধারণা যদি আরব দেশে সোভিয়েট হয়, তবে ভগবান মরবে। ভগবানকে তাঁর জীবিত রাখা চাই-ই। অনেক বার তিনি ইংলিশ ভাষায় বলছিলেন, "ভগবান দীর্ঘজীবি হউন" ইত্যাদি আমি নীরবে সকল কথাই শুনে যাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম ফিলিস শব্দটি কি করে জন্ম গ্রহণ করল। ফিলিস্‌ শব্দের জন্ম কি করে হয়েছিল, তা দেশে এসে বুঝতে পেরেছিলাম।

কটকের কাছে একটি নদীতীরে দাঁড়িয়ে একজন উড়িয়া ভদ্রলোকের সংগে কথা বলছিলাম। তিনি আমাকে চিনতেন। আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বলুন ত পয়সা কথাটা

কোন দেশের ? আমি তাঁর প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হইনি। তিনি আমাকে বলেছিলেন পয়সা কথাটা পর্তুগীজ শব্দ। অবনতমস্তকে তার কথা মেনে নিয়ে ভাবতে লাগলাম, গুজরাতীরা এখনও পয়সাকে ফুল বলে। ফুল কথাটি পুষ্প শব্দেরই অপভ্রংশ। ইরানীরাও পয়সাকে ফুল বলে, আর আরবরা বলে ফিলিস্। জার্মানদের যদিও এক শত সেণ্টে এক মার্ক হয়, তবুও জার্মানরা কখনও সেণ্টকে সেণ্ট বলে না, তারা সেণ্টকে পেনীই বলে। এদিকে হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ছেড়ে হঠাৎ আবার বৃটেনে পেনী শব্দের ব্যবহার হয়। পেনী আর পয়সায় বড় বেশি তফাৎ নাই। যা হোক ঘুরে ফিরে ঘরের ধন পুষ্প বা ফুল ঘরেতে পয়সারূপে ফিরে এসেছে। আমার ধারণা ত হল এরূপ, এখন পণ্ডিতগণ বই ঘেটে কি বলবেন তারাই জানেন।

ফিলিস্ বা পয়সা শব্দের জন্ম যে প্রকারেই হউক, এখন আসল কথায় আসা যাক। সূর্য তখন অস্ত যায় যায় হয়েছিল। দলে দলে লোক এই ছোট গ্রামখানিতে এসে জড় হতে লাগল। সন্ধ্যার একটু পরেই তাঁবুতে তাঁবুতে সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট বাতি জ্বলে উঠতে লাগল। প্রত্যেকেই আপন আপন পণ্য তাঁবুর সামনে সাজাতে লাগল। সব সাজান হয়ে গেলে, কেউ কিনল আর কেউ বেচল। আবদুল্লা বেশ ভাল মুনাফাই করলেন এবং সে মুনাফার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। তারপর আরম্ভ হল "খানা আর পিনা"। একে অন্যের তাঁবুতে গিয়ে একটু আধটু কিছু খেতে লাগলেন আর পান করতে লাগলেন আরক। আরক আমাদের দেশী মদের মতই এক প্রকারের মদ, তবে তাতে ভেপসা গন্ধ ছিল না, এবং জলে ঢালা মাত্র সোডার জলের মত একটু ঘোলাটে হবার পরই সাদা রং ধারণ করে। এরূপ মদ বড়ই উগ্র এবং চায়ের পেয়ালার এক পেয়ালা খেলেই ভয়ানক নেশা হয়। আমি এবং আবদুল্লা প্রত্যেক তাঁবুতে গিয়ে একটু খাদ্য এবং ছোট পেয়ালাতে এক পেয়ালা আরক খেতে লাগলাম।

"খানা এবং পিনা" শেষ হয়ে গেলে আমার বেশ গরম অনুভব হতে লাগল। তবে দিনের গরম এক, এটা হল পেটের গরম। পেটের গরম কমাবার জন্য বাইরে গিয়ে বালির উপর শুয়ে রইলাম।

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। আকাশের তারকারাজি ঝলমল করছিল। মৃদুমন্দ শীতল বাতাস প্রাণে মাদকতা এনে দিচ্ছিল। বালিরাশির উপর কোন রূপ কীটপতংগ না থাকায় বালিরাশিকে তূলার মতই অনুভব হচ্ছিল। মাঝে মাঝে দু একটা যুবক সারেংগী বাজিয়ে গান করছিল। কেউবা নর্ত্তকীর পোষাকে ব্যবসায়ীদের মনোরঞ্জন করছিল। কোন কোন ব্যবসায়ী শরীরে 'মাসাজ' নিচ্ছিল। বাইরে শুয়ে শুয়ে এই সব দেখে আবদুল্লাকে এসে বল্লাম, মশাই আরব্য রজনী বাস্তবিক আরামের, কিন্তু সে আরাম হতে আপনি এবং আমি বঞ্চিত। আবদুল্লা বল্লেন, আপনি ভগবান মানেন না, তাই ভগবান আপনার ভাগ্যে তা লিখেননি। আমার ভাগ্যভাল কি মন্দ তা জানি না, তবে এরূপ আনন্দ আমি পছন্দ করি না। যদিও আবদুল্লা রাগ করেই কথাটা বললেন, তবুও আমার মনে হল আরবগণ অন্যায়ের প্রতিকার করে। তারা ছাগশিশুর মত অন্যায় হজম করে না। তারা ছাগশিশুর মত অন্যের দ্বারা আহত হয় না, ভক্ষিতও হয় না। তারা নিজেদের রক্ষা নিজেরাই করতে পারে। ব্রহ্মচর্যকে মরালিটি বলে না, মরালিটি বলে আত্মসম্মান বজায় রাখাকে। আরব জাত আত্মসম্মান রক্ষা করতে জানে। রাগ এবং অহঙ্কার উভয়ই তাদের আছে। দয়া যে নাই তা বলা চলে না। যদি ওদের মনে দয়া এবং উদারতা না থাকত, তবে আমার মত লোককে আবদুল্লা অতিথিরূপে গ্রহণ করতেন না। আমাদের দেশের ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীদের দেখে আরব সভ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ করা যেতে পারে না। আবদুল্লা ভাল করেই জানেন, আমি ভগবান এবং তাঁর প্রেরিত পুরুষদের কথা বাজে বলেই মনে করি। মুসলমানরা যে খাদ্য খায় না, তা আমি খাই, তবুও আমাকে অতিথি

করা হয়েছে। আমাকে অতিথি করে তাঁর একটি পয়সা লাভ হয়নি, বরং তাঁর অনেক খরচই হয়েছে। আমাকে বাগদাদে পৌঁছে দিয়ে আমার সাইকেল রেল-ষ্টেশন হতে খালাস করে তাঁকে নিতে হয়েছে। এসব করতে তাঁর বেশ খরচ হয়েছিল।

রাত গভীরতর হয়ে এসেছে। কোন প্রাণীর চলাফেরা নাই। চার দিক নীরব নিস্তব্ধ। আমি আরামে গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলাম। এমনি সময় কে যেন আমার শরীরে হাত দিল। হাতের স্পর্শেই বুঝলাম এটা ডাকাতের হাত নয়, বহুরূপীর। বহুরূপীকে তাড়িয়ে দিলাম। পরের দিন সকাল বেলা বহুরূপীকে চিনলাম। সে একটি চাকরমাত্র। সে রাত্রে মাসাজ করে কিছু রোজগার করে। আমি তখন মাসাজের পক্ষপাতী না থাকায় শ্বেতকায় আরবগণ আমাকে নিগ্রো শ্রেণীর পর্যায়ে ফেলেছিল। এ সম্বন্ধে আবদুল্লা এবং আমাতে নানারূপ আলোচনা হয়। এসব কথা ভ্রমণ-কাহিনীতে স্থান পায় না বলেই পরিত্যাগ করা হল।

রোদের তেজ আজ আরও একটু বেড়েছে। তাপমান-যন্ত্রে উত্তাপ বোধ হয় এক শত কুড়ি ডিগ্রিতে উঠেছে। আকাশে বালুকণা একটুও উড়ছে না। আমরা আধমরা হয়ে দরজায় খিল দিয়ে শুয়েছিলাম ভৃত্যদেরও সেই অবস্থাই ছিল। জিহ্বা যখন শুকিয়ে যেত তখন সামান্য জল দিয়ে জিহ্বা ভিজাতাম। এরূপ ভাবে সময় কাটাতে মোটেই ভাল লাগছিল না। দ্বিপ্রহরের নামাজের সময় এল। সাথীরা সবাই উজু করতে গেল, আমিও উঠলাম এবং জল নিয়ে তাদের মত উজু করে অনেকটা শান্তি পেলাম। সাথীরা নামাজ পড়ল, আমি বসে তাই দেখলাম।

কাজ কিছুই ছিলনা, অথচ ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা আমাকে কাতর করে ফেলছিল। গরম দেশে খাবারের প্রবৃত্তি যেমন হয়, ঠাণ্ডা দেশে তেমন হয় না। সন্ধ্যায় কেনাবেচা হয়ে গেলে আমি ঘরে ঢুকলাম না, মরুভূমিতে একাকী বেড়াতে লাগলাম। রাতে মরুভূমিতে বেশি দূর

যাওয়া উচিত নয়, সেজন্য বেশি দূর যাইনি। পথের ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। শুধু পথের ভুলের ভয় নয়, আরও ভয় আছে। মরুভূমিতে বেশ ডাকাতি হয়। মরুভূমির আরব পারতে চুরি করে না, ডাকাতি করতেই পছন্দ করে। তবে পুরাতন শত্রুর বাড়িতে ডাকাতি করতে না পারলে চুরি করাটাও দোষের নয়। এখানে পুরাতন শত্রুতার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। মরুভূমিতে এখনও নানারূপ নিয়ম প্রচলিত আছে। সেই নিয়ম-কানুনগুলি অনেক কমেছে। খৃষ্টান মিশনারীরা অনেক অজানা বিষয় সর্বসাধারণের জ্ঞাত করেছেন সত্যকথা, কিন্তু তাঁদের কথার মাঝে এমনি একটা টান রয়েছে যাতে করে লোককে বুঝিয়ে দেওয়া হয় তাঁরা যা দেখেছেন তার আর অদল-বদল হবে না। আরবদের সম্বন্ধে যাঁরা সেই পুরাতন কথা পরিবর্তন হবেনা বলে ধারণা করবেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ঠকবেন। কারণ মানুষের স্বভাব এবং সমাজের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনবরত বদলাচ্ছে। আরবরাও মানুষ, অতএব তাদেরও উন্নতি নিশ্চয়। আরবদের মাঝে যে সকল পুরাতন নিয়ম এখনও বর্তমান রয়েছে, তার পেছনে রয়েছে ক্রমবিকাশের ইংগিত গ্রহণ করার অভাব।

রাতে ধনী ব্যবসায়ীরাই পথে চলে? ব্যবসায়ীদের অপর নাম বেদুইন। বেদুইন সকল সময় অস্ত্রে সজ্জিত থাকে। লোকজনও কম থাকে না, খণ্ডযুদ্ধ প্রায়ই হয়। লোকক্ষয় মন্দ হয় না। এরূপ লোকক্ষয় যাতে না হয়, সেজন্য বিদেশী শাসকশ্রেণী আরবদেরও ভারতবাসীর মত নিরস্ত্র করার পক্ষপাতী। কিন্তু আরব এমন আইন মানে না যে আইন তাকে এবং তার সমাজকে পুরাপুরি ভাবে রক্ষা করতে পারে না। সেজন্য আরব অস্ত্র বানায়, বেচে এবং কিনে, অন্যায় আইন মেনে চলে না।

যে সকল আরব নিরীহ এবং গরীব, তারা অস্ত্রও রাখে না এবং সেজন্য শক্তিশালী আরব তাদের কোন অনিষ্টও করে না। আমাদের সংগে অস্ত্র ছিল না, সেজন্য ধনী আরব আমাদের ঘাটাত না।

একদিন দিনের বেলা হঠাৎ আমাদেরই একটা লোক চীৎকার করতে থাকে। কতক্ষণ পর কতকগুলি ঘোড়সওয়ার আমাদের কাছে এল এবং দেখল আমাদের কাছে কোন অস্ত্র আছে কিনা। যখন তারা দেখল আমরা নিরস্ত্র এবং মামুলী ব্যবসায়ী, তখন তারা আমাদের বাঁয়ে রেখে একটু চলে মোর ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে গেল।

একটু বেড়িয়ে এসে যখন আমি বেঁচা-কিনা দেখছিলাম, তখন হঠাৎ একদল আরব গ্রামের কাছে এসে দেখা দিল। অনেকেই কেনাবেচা বন্ধ করে চীৎকার করতে লাগল। নবাগত আরবদল একটু দূরে তাঁবু গেড়ে বিশ্রাম করতে লাগল। তারা প্রত্যেকে তলওয়ার এবং বন্দুকে সজ্জিত ছিল এবং যে কোন মুহূর্তে লড়াই করতে প্রস্তুত ছিল। এদিকের আরব শ্বেতকায়, দীর্ঘ এবং চিক্কণ। তাদের শরীরে প্রচুর শক্তি অথচ খায় অতি কম। অতি অল্প সময় এরা ঘুমায়। মন তাদের অতি সরল অথচ রাগ সিংহের মত। মরণ ওদের সকল সময়ই পদানত, তবুও তারা পরাধীন। বৃটিশ ফ্রেন্‌চ, ইতালী তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। এর কারণ কি তাই অদূরে দাঁড়িয়ে আমি ভাবছিলাম। বর্তমানে ইতালী কলনী আর নাই।

রাত গভীর হতেই আমরা স্থান ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হলাম। উট লাদাই করা হল, তারপর আমরা উটে চড়লাম। উট উঠে দাঁড়াল। উটের নাকে রশি লাগান থাকে। রশি লাগাবার জন্য নাক ফুটিয়ে ছিদ্র করতে হয়। উটের নাকে ফুটান কাজটা সকলের দ্বারা হয় না। কশাই শ্রেণীর লোকই সেই কাজ করে। কশাই শ্রেণীর লোকের স্থান সমাজে সর্বনিম্নে। অনেকেই কশাইএর সঙ্গে এক আসনে বসতে চায় না। মনে মনে ভাবতে লাগ্‌লাম, কশাই ছাড়া সমাজ চলতেও পারে না, তবে কেন কশাইকে ঘৃণা করা হয়। উটের নাক ফুটান কাজটাও নির্দয়তায় পূর্ণ, সেই জন্যই কশাইরা সেই দয়াহীন কাজ করে। ইচ্ছা করলেই উটের নাক না ফুটিয়ে

সুপার বা হুপার* ব্যবহার করতে পারে। খৃষ্টান আরবগণ সুপাই পড়িয়ে দেয়, নাক ফুটায় না। এই প্রকারের নানা চিন্তায় সময় কাটিয়ে বেলা দশটার সময় আমরা ইউফ্রেতীজ নদীতীরের এক বৃহৎ গ্রামে এসে পড়লাম।

গ্রামে অসংখ্য ঘর, কিন্তু একটিও পাকা ঘর ছিল না। ঘরগুলি কাদার দ্বারাই তৈরী। গ্রামের একটি সরাই-এ আমরা আশ্রয় নিলাম। সরাইএ থাকার জন্য আমাদের বেশি টাকা খরচ করতে হয়নি। সরাই বলতে একটি লম্বা ঘর অনেকগুলি কুঠরীতে ভাগ করা। কুঠরীতে দুজন করে লোক থাকতে পারে। আবদুল্লা এবং আমি প্রত্যেকে একটি কুঠরী দখল করার পর অন্যান্য সংগীদের জন্য আরও চারিটি কুঠরী নেওয়া হল। অন্যান্য কুঠরীতে তিন চার জন করে থাকবার ব্যবস্থা হল। আরবদের প্রথামতে প্রথম সুমিষ্ট কাফি তারপর খাবার খেয়ে প্রত্যেকেই শুয়ে পড়লাম। বিকালে বেড়াবার সময় কতকগুলি আরব মেয়েলোকের সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়। এদের শরীরের রং দেখে আমি বেশীক্ষণ বাইরে না থেকে একদম কুঠরীতে এসে ডাইরী লিখতে আরম্ভ করলাম।

এদের রং ইউরোপীয়দের মত সাদা নয়, আরবদের মত পীত এবং সাদায় মিশানো নয়। অনেকক্ষণ চিন্তা করে ঠিক করলাম, এটা পাণ্ডু রং ছাড়া আর কিছুই নয়। রং ঠিক হয়ে গেলে ফের বেরুলাম। গ্রামে যতগুলি পুরুষ দেখলাম তাদের মাঝে পাণ্ডু রং-বিশিষ্ট লোকের সংখ্যা অতি অল্প। অন্যান্যগুলি হয় বাদামী অথবা সাদা, নয়ত একদম সিমেটিক। পাণ্ডু রংএর লোকগুলি বেঁটে, মজবুত এবং স্বল্পভাষী। স্ত্রীলোকগুলিও সেরূপই। উল্কিপরা এদের একটা আনন্দের বিষয়। হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের উল্কিপরা দেখলে মনে হয়,

* হুপা শব্দটি আসামে গুজরাতে এবং পুরবীয়া হিন্দিতে প্রায়ই ব্যবহার হয়। বঙ্গদেশেও ব্যবহার হতো, কিন্তু যেদিন থেকে "হাপা" সাপ হলো, সেদিন থেকে "হুপা" হুপা হয়ে গেল। হুপা কথাটাও ইরানে ব্যবহার হয়।

ওরা যেন সর্বাংগ উল্কিতে ভর্তি করে রাখতে চায়। কিন্তু পাণ্ডু রং-বিশিষ্ট আরব রমণীদের সংগে বাংলার কোন কোন স্থানের মেয়েদের উল্কি পরার বেশ মিল আছে। প্রত্যেক গালে পাঁচটা করে ছোট বিন্দু। ভ্রূযুগলের মাঝে একটি বিন্দু। হাতের কনুএর উপর একস্থানে মাত্র তিনটি বিন্দু। এর বেশি উল্কি আর কোথাও দেখিনি। এরা পর্দানশীন নয়, তবে পুরুষদের সংস্পর্শে বড় আসে না। আবদুল্লা বল্লেন, "এরা জাতে আরব, আরবী ওদের মাতৃভাষা, তবে ওরা ইসলাম ধর্মের ধার ধারে না। ওরা কোনও জীবের গলা কাটে না। এক আঘাতেই হত্যা করে।" সংগে সংগে বললেন, "দেখুন ওরা কত নির্দয় এবং পৈশাচিক।" কথাটার কোন প্রতিবাদ করিনি।

গ্রামের পাশেই একটা বড় জলাভূমি। জলাভূমি আশে পাশে খেজুরের বাগানে ভর্তি। বাগানগুলি সুন্দর। জল কিন্তু সুস্বাদু নয়, লোনা। এতে কেউ স্নান করে না। আমি লোনা জলেই স্নান করলাম। আমার সংগে যে দুটি আরব ছেলে এসেছিল, তারা আমার নগ্নমূর্তি দেখে ভীত হয়েছিল। এরূপ হবার কথাই। এদেশে গরমের সময়ও লোক কাপড় দিয়ে শরীর ঢেকে রাখে। দরিদ্র ছাড়া কেউ পায়ের ডগাও দেখিয়ে পথে বের হয় না। স্নানান্তে কাপড় পরে ফের মুসাফিখানায় গেলাম। মুসাফিরখানাতে অনেক লোক এসেছে, শুধু আমাকেই দেখ্তে। অনেক ভারতবাসী এদিকে গত যুদ্ধের সময় এসে লড়াই করেছিল, তাদের কেহ কেহ এদিকে বিবাহ করে বসবাসও করছে। তবুও আমাকে দেখে যাবার একমাত্র কারণ হল আমি মুসাফির এবং ভগবানে অবিশ্বাসী। কেউ আমাকে সালাম-আলায়কুম্ বলল না, কারণ যার অস্তিত্ব আমি স্বীকার করি না, সেই জিনিষটা কি করে আমাকে আশীর্বাদ করতে পারে। আবদুল্লা তাই আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, "এই জন্যই এরা আমাকে সালামত্ বল্ছে। সালামত মানে আশীর্বাদ।" আমিও

বললাম,"তোমাদের আশীর্বাদই আমি চাই। যার সত্ত্বা সম্বন্ধে আমার কোনও জ্ঞান নাই তার আশীর্বাদ আমি চাই না। যে সকল লোক একত্র হয়েছিল, তাদের মাঝে অমুসলমানই বেশী। তারাই আমাকে দেখ্‌বার জন্য ঔৎসুক্য দেখিয়েছিল। অনেক আসিরিয়ান্‌ এ গ্রামে বাস করে। আসিরিয়ান্‌রা আমাদের দেশের শিখদের মত দাড়িগোঁফ কামায়না, তবে হাতে লোহার বালা, কৃপাণ এবং "আণ্ডারওয়ার" ব্যবহার করে না। আসিরিয়ানরা আমাকে প্রশ্ন করল ভগবান সম্বন্ধে। কখনও তারা আল্লা শব্দ ব্যবহার করেনি, সকলেই খোদা শব্দ ব্যবহার করেছিল। এদিকে আর্মেনীয়ানরাও এসে বসবাস সুরু করেছে। আর্মেনীয়ানদের চলাচল ইউরোপীয়দের মতই, ঘরের গঠনও একদম ইউরোপীয় ধরণের। আর্মেনীয়ানরা ভঁয়ানক গো-খাদক বলে এদিকে গোমাংসের দাম দ্বিগুণ হয়েছে। শূকর মাংসের প্রচলন নাই বললে চলে। খৃষ্টান আরব এবং আর্মেনীয়ানরাই শুধু শূকর মাংসের ব্যবহার করে।

দাস ব্যবসা

দাস ব্যবসা পৃথিবীতে আর কোথাও নাই—এ বলেই আমরা বড়াই করি। কিন্তু পুরাতন দাস ব্যবসা উঠে গিয়ে নূতন দাস ব্যবসার প্রবর্তন হয়েছে। নূতন ধরণের দাস ব্যবসার সংবাদ অনেকেই রাখেন না। মনেও হয় না চোখের সামনের অত্যাচারই পুরাতন দাস ব্যবসার দ্বিতীয় সংস্করণ। সকালবেলা সূর্যোদয় দেখে যখন বিমর্ষ বদনে রুমে ফিরছি, তখন দেখলাম কতকগুলি যুবক সারারাত সূচের কাজ করে সকালবেলাও হাতের সুচ চতুরতার সহিতই চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের চোখ রক্তাভ, মুখে কালো দাগ, শরীর দুর্বল, তবুও মুখে নূতন যৌবনের ছাপ এখনও বিদ্যমান। জিজ্ঞাসা করে জান্‌লাম, এরা সেলাই-এর কাজ দিনের মাঝে পনর ঘণ্টা করে, বাকি সময়টুকু আহার ও নিদ্রায় কাটায়। এত অল্প সময় আহার নিদ্রায় কাটিয়ে বাইরে যাবার তাদের ফুরসুৎ হয় না, তাই তাদের এই দুর্দশা। পৃথিবীর কত স্থানে কত মজুর এরূপ পেটের দায়ে অকালে যৌবন হারিয়ে বৃদ্ধ হচ্ছে, তার হিসাব কে রাখে। আমরা বলি বেশ সভ্য হয়েছে ; কিন্তু চোখ থাকতে অন্ধ, অসভ্য ধনী শেঠ বুঝতে চেষ্টা করে না, এক মুঠা অন্নের জন্য তাদেরই দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় কেনা গোলাম হয়ে জীবন কাটাচ্ছে।

এরা আরব, এদের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ? কিন্তু এরা পৃথিবীর বাইরে বসবাস করে না। এদের দুঃখের দীর্ঘনিঃশ্বাস আরবের মরুভূমি ছাড়িয়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উৎপাদিকা শক্তিসম্পন্ন সুজলাং, সুফলাং, শ্যামল ভূমিতে এসে নিশ্চয়ই পৌঁছবে। এত কঠোর পরিশ্রম পরিত্যাগ করে ওরা অন্য কাজে কেন যায় না জিজ্ঞাসা করায় একজন বলল, "ওদের ডানা ভেংগে গেছে। উড়বার আর

শক্তি নাই।" আরব দেশের মেয়েরাও খুব উৎসাহী, সাহসী এবং স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে পিস্তল, বন্দুক এমন কি বর্শা ছুড়তেও ওস্তাদ। সেই দেশে যুবকের ডানা ভেংগে গেছে, উড়্তে আর পারছে না, তা কি আশ্চর্যের বিষয় নয়? একেই বলে দ্বিতীয় সংস্করণের দাস ব্যবসা। ধনীরা এক দাস ব্যবসা উঠিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় দাস ব্যবসার পত্তন করেছে। এটাও একটা প্রগতি। পৃথিবীর সর্বত্রই এরূপ দাস ব্যবসা দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু আরব দেশে তার প্রবর্তন কি করে সম্ভব হল, তাই ছিল বিবেচ্য বিষয়।

আরব দেশের বেদুইনের কথা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যেরূপ ভাবে বলে গেছেন, পৃথিবীতে এমন ভাবে কোন কবি আরবের গুণ-গরিমা গাইতে সক্ষম হননি। কিন্তু এই আরব জাতের মাঝে নানারূপ দাসত্ব দেখে আমার মন ক্রমাগত আঘাত পাচ্ছিল। ভারতের সংগে তুলনা করেই সকল জিনিস, সকল গুণ বুঝতে চেষ্টা করতাম, কিন্তু আরব দেশে গিয়ে আর ভারতের কথা মনেও হয়নি। ভারতের চির-নির্যাতিত দরিদ্র হরিজনের কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম। যারা চিরদিনের পদদলিত, নির্যাতিত, তাদের দোষগুণ নিয়ে বিচার করা সকল সময় ভাল লাগত না।

সন্ধ্যার পর গ্রামে বেড়াতে বের হলাম। গ্রামবাসীরা আমাকে বেশ আদর-যত্ন করল। আরব জাতের যে কোন ধর্মাবলম্বীর বাড়ীতে গেলাম এবং দেখলাম সকলের আচার-ব্যবহার একই ধরণের। মাটীতে উনুন করে পাক করা, মাটিতে বসা, মাটিতে বসে খাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু নবাগত আর্মানীরা আরব দেশে এসেও তাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। উনুনগুলি মাটি হতে অন্তত দুহাত উঁচু মাচার উপর করেছে। পাকঘরে টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা আছে। আরবগণ যেমন করে কাঠের মাচার উপর শোয়, সেরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। প্রত্যেকের ঘরেই লোহার খাট। খাটে কাউকে বসতে দেওয়া হয় না, অথচ আরবদের খাটে যে সে এসে বসতে পারে।

আরমানীদের ঘরে এলেই উন্নত ধরণের মনের পরিবর্তন আপনি এসে দেখা দেয়।

গ্রাম বেড়িয়ে এসে যখন ঘরে বসলাম, তখন দেখলাম সকলের উৎসুক দৃষ্টি আমার প্রতি ছিল। আমি গ্রাম দেখে কি অনুভব করেছি তাই বললাম। যখন আমি আর্‌মানীদের গুণকীর্তন করছিলাম, তখন একজন বললেন "এরা যে খৃষ্টান"। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, তাই বলতে বাধ্য হলাম, "আপনাদের মাঝেও খৃষ্টান, ইহুদী-সূর্য্য-উপাসক, পাথর এবং জল-উপাসক আছে, কিন্তু আপনাদের মাঝে কোন প্রভেদ দেখলাম না। সুন্নি যেমন করে ঘরে থাকে, জল-উপাসকও তেমনি ঘর করে, কিন্তু যদি তলিয়ে দেখেন তবে বুঝবেন আর্‌মানীরা আপনাদের চেয়ে অনেক উন্নত। আরও একটা কথা শুনুন, আর্‌মানীরা প্রচুর গোমাংস খায়। ভারতবর্ষে গো-হত্যা নিয়েই হিন্দু-মুসলমানে লড়াই হয়। আমি হিন্দুরই ছেলে, গোহত্যা এখনও আমি পছন্দ করি না, তবুও আমি আরমানীদের প্রশংসা করছি। ভালকে যদি ভাল বলতে না শিখলাম, তবে দেশ ভ্রমণ করে লাভই বা কি? আপনাদের দেশে আসার পর যেরূপ ভাবে আমি ভগবানের সত্বা অস্বীকার করছি, ঠিক সেরূপ ভাবে কথা বললে হয় ত আমার নিজের সম্প্রদায়ই আমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে। আপনাদের উদারতার কথা দেশে গিয়ে নিশ্চয়ই বলব। ভালকে ভাল বলতে হবেই, এতে ধর্ম্মের হুম্‌কীকে ভয় করলে চলবে না।"

আজ মহাভোজ। গ্রামের লোক নানারূপ পিঠা আমার জন্য পাঠিয়েছে। আর্‌মানীরা পিঠা না পাঠিয়ে নানারূপ "পুডিং" পাঠাল। আমাদের আস্তানার অনেকটা যায়গা তাতে ভর্তি হল। এসব খাবার খেতে আমার ভয়ানক ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু যার অতিথি, তিনি যদি খেতে আদেশ না করেন, কোন মতেই কিছু খাওয়া চলে না। আমি সে প্রতীক্ষায় বসে রইলাম। অনেকেই অনেক

কথা জিজ্ঞাসা করল, আমি কিছুরই জবাব না দিয়ে খাবারের কথাই চিন্তা করতে লাগলাম। অনেকে বলছিল, আমি আমার মনকে নিয়ে স্বর্গে চলে গেছি, কিন্তু তারা জানত না আমার মন তখন প্রত্যেকটি পিষ্টকের ভেতরে ভেতরে ঘুরছিল এবং পিঠারই রূপ এবং রসের কথা চিন্তা করছিল।

খাবারের সময় হয়ে এল, আমাদের খাবার বয়রা দিয়ে গেল। মিষ্টি সর্বপ্রথম আরম্ভ করলাম। প্রত্যেক রকমের একটি করে পিঠা অতি সন্তর্পণে খেলাম এবং বুঝতে চেষ্টা করলাম আমাদের এবং আরবদের পিঠার সংগে কি পার্থক্য রয়েছে? আরব পিঠায় এবং আমাদের পিঠায় কোন প্রভেদ আছে বলে মোটেই মনে হল না। প্রভেদ না থাকার কারণ কি তাই অনেকক্ষণ ভাবলাম। আবদুল্লা বার বার পিঠার সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করায় আমি বললাম, আরব দেশের পিঠার সংগে ভারতের পিঠার বেশ মিল আছে, এমন কি আরব পিঠাতে ভারতের পরাধীনতার গন্ধও আছে।

চোখের নিমিষে আবদুল্লার চোখের উপর অনেকের চোখ পড়ল। ভাবের আদান-প্রদান হল, তারপর আবদুল্লা বললেন, "তবে পিঠাগুলি বেশ ভালই হয়েছে, আপনি ভাল ইংলিশ জানেন না বলেই কথাটা উল্টাপাল্টা করে ফেলেছেন। "পরাধীনতার" স্থলে "সুগন্ধ" শব্দেরই ব্যবহার করার ইচ্ছা আপনার ছিল, পিঠা পেট ভরে খেয়েছেন বলেই শব্দের অপ-প্রয়োগ করছেন, তা নয় কি?" আমিও তৎক্ষণাৎ বল্লাম, "নিশ্চয়ই আমার ভুল হয়েছে, ইংলিশের কোন্ কথার কি মানে হয় তা সকল সময়ে মনেও থাকে না। আমাকে এই গর্হিত ভুলের জন্য ক্ষমা করবেন মহাশয়গণ।" এতে সভায় শান্তভাব ফিরে এল দেখে আমিও শান্তি ফিরে পেলাম।

এটাকেই বলে উগ্রসাম্রাজ্যবাদ। মুখ খুলেছ কি মরেছ। উগ্র-সাম্রাজ্যবাদ সকল দেশে প্রচলন করার দরকার হয় না। যে দেশে

বিদ্রোহ করবে বলে মনে হয়, সে দেশে উগ্র সাম্রাজ্যবাদ চালাতে হয়। আজ খেতে বসে তারই একটু নমুনা দেখতে পেলাম।

আরব গরুও নয় উটও নয়। আরব আরবই। বিদ্রোহ করা তার জন্মগত অভ্যাস। তাকে দাবীয়ে রাখতে হলে উগ্রসাম্রাজ্য-বাদের ব্যবহার সাম্রাজ্যবাদী করবেই। আরব দেশ যদিও খণ্ডে খণ্ড বিভক্ত হয়ে নানা শ্রেণীর উগ্রসাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে, তবুও আশা আছে আরবজাত বেশী দিন পরাধীন থাকবে না। ভাষা দিয়ে মানুষের জাতের নির্ণয় হয়। আরব দেশের সর্বত্র আরবী ভাষা চলে। অতএব আরব জাত একদিন একত্রিত হবেই। অনেকেই বলবেন, ইংলিশ এবং আমেরিকান একই ভাষা বলে, তারা একত্রিত থাকে না কেন? তার প্রথম কারণ হল ভৌগোলিক বিভিন্নতা এবং একদিন একে অন্যকে শাসন করেছিল। আমেরিকানরা যখনই তাদের পুরাতন ক্ষতের দাগ দেখে তখনই তারা মনে করে—শাসিত এবং শাসকের প্রভেদ। আরব জাতের মাঝে এখনও "ক্লান" প্রথা রয়েছে; অতএব শাসক এবং শাসিত এ কথার আরোপ হতে পারে না। আরব-ভাষাভাষীদের একই ষ্টেটে স্বাধীন ভাবে বাস করার সময় এগিয়ে আসছে।

বড় গ্রামে অনেক কিছু দেখে এবং অনুভব করে আর এগিয়ে যেতে ইচ্ছা হল না। আবদুল্লার একটি লোককে সাথে করে নিকটস্থ রেলষ্টেশনে গিয়ে একখানা টিকিট কিনে বাগদাদের দিকে রওয়ানা হলাম। বিদায়ের পূর্বে আবদুল্লা আমাকে আলিংগন করে বলেছিলেন—বাগদাদে গিয়ে যেন নিজের চোখে বাগদাদ দেখি। পরের চোখে কিছু দেখবার আমার অভ্যাস ছিলনা, তাই বাগদাদ আমার মনমতই দেখতে সক্ষম হয়েছিলাম। তবে যা দেখা যায় এবং যত কিছু শুনা যায়, তার সবটা লেখা চলে না।

বাগদাদ

উঁচুনীচু ভূমি। তারই ভেতর দিয়ে রেলপথ এঁকেবেঁকে চলেছে। গাড়িতে ভ্রমণ বেশ আরামের মনে হচ্ছিল। দুদিকের দৃশ্য তেমন আরামদায়ক ছিল না। গাড়ী কংকর ভূমির ভেতর দিয়ে চলছিল। দুপুরবেলা একটা পরিত্যক্ত কংকর ভূমি ভেদ করে গাড়ি বাগদাদ ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। ষ্টেশনের লাগেজ রুম হতে সাইকেল বের করে সাইকেলটা পরীক্ষা করে দেখলাম, ঠিকই আছে। অনেকদিন পর সাইকেলের সাক্ষাৎ পেয়ে বেশ ভালই লাগল। সাইকেল পিঠ-ঝোলা বেঁধে শহরের দিকে চললাম। বাঁ দিকে প্রকাণ্ড প্যালেস্। প্যালেসের চারদিকে নানা রকম ফুলের বাগিচা। পথে পিচ দেওয়া। সাইকেল চালাতে কষ্ট হচ্ছিল না। কয়েক মিনিটের মাঝেই মোদী-ব্রীজের কাছে আসলাম. ব্রীজ পার হতে হতে টেক্স দিতে হয়। আমিও তাই দিলাম। ব্রীজটা বড়ই সুন্দর। নীচে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তাইগ্রীস নদী বয়ে যাচ্ছে। নদীতে নানারূপ দেখবার জিনিসও ছিল, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তাই দেখলাম। নদীতে বড় বড় হাঁড়ি দিয়ে একপ্রকার ভেলা তৈরী হয়। সে ভেলার উপর কয়েক জন লোক বসে নদী এপার ওপার করতে পারে। কতকগুলি বড় হাঁড়িও দেখলাম। তাতে আরাম করে দুটা লোক বসে হাতের সাহায্যে নদী পার হয়। দৃশ্যটী আমার কাছে নূতন ছিলনা। আমাদের গ্রামের এরূপ বড় বড় হাঁড়িতে করে গরীব লোক বর্ষার সময় আগে চলা ফেরা করত। বর্তমানে কচুরী-পানার জন্য সেরূপ "অর্ণবপোতের" ব্যবহার লোপ পেয়েছে। পৃথিবী-বিখ্যাত হারুন-উল-রসিদের শহরে এখনও এ সনাতন প্রথা বর্তমান আছে দেখে নিজের গ্রামের কথা মনে হল।

বেশীক্ষণ মোদী বৃক্ষের উপর না দাঁড়িয়ে ওপারে এসে বড় পথে পৌঁছবার পূর্বেই একজন সিন্ধির সংগে সাক্ষাৎ হয়। সিন্ধি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কোথায় থাকা যায় সেই সন্ধান নিয়ে বড় রাস্তায় এলাম এবং আর্য-সমাজের বাড়ির দিকে এগিয়ে চললাম।

আর্য-সমাজ বেশি দূর ছিল না। ম্যন রোডের বাঁদিকে তিনটা গলি পেরিয়ে চতুর্থ গলিতে ঢুকে একটু এগিয়ে গিয়ে আর্য-সমাজের বাড়িটা দেখতে পেলাম। দু'তলা সুন্দর নতুন বাড়ি হয়েছে। যারা পলিটিক্স নিয়ে মাথা ঘামায় না তারা ধর্ম-মন্দির তৈরী করে শান্তি পায়। আমি সেই শান্তিতে ভাগ বসাতে গিয়ে দেখলাম—সমাজের দরজা বন্ধ। অনেক ডাক-হাঁকের পর একজন লোক বেরিয়ে এল। সে জাতে ইরানী, অবয়বে মোংগল, ধর্মে সিয়া। লোকটি পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন। এসেই আমাকে উর্দু অর্থাৎ হিন্দুস্থানীতে নানা কথা জিজ্ঞাসা করে দরজা খুলে দিল। সে আমাকে বল্ল, এখানে যদি আমি থাকি তবে অনেকেই আমাকে অপছন্দ করবে। কারণ আর্য-সমাজ এদেশে স্থাপিত হবার পর থেকেই হিন্দিদের মাঝে জাতিভেদ এসে দেখা দিয়েছে। এ শহরে আরব আমাকে কোন রকমেই সাহায্য করবে না। হিন্দিদের আরবরা এদেশ হতে তাড়াতে মনস্থ করেছে। অতএব হিন্দিদের সাহায্যের উপর যদি আমাকে নির্ভর করতে হয় তবে এখানে থাকা কোন মতেই উচিত নয়। দ্বারওয়ানের কথা শুনে আমি চিন্তিত না হয়ে তাকে সর্বপ্রথম ধন্যবাদ দিয়ে করমর্দন করলাম এবং পরে তার উপদেশ মতেই এগিয়ে যেতে লাগলাম।

তাইগ্রীস নদীর তীরে একজন বিহারী ওভারসিয়ার থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন বাংগালী, তাই তাঁর বাড়িতেই যাওয়া মনস্থ করে ম্যন রোডের ওপর দিয়ে চলতে লাগলাম। ম্যন রোডের নাম কি করে ইংলিশ নাম পেল তা আমার জানার ফুরসুৎ হয় নি। প্রায়

তিন মাইল চলে গিয়ে বাঁদিকে ফিরলাম। পথ নাই বললেও চলে। আরব গ্রামের মাঝ দিয়ে যে পথ হয় তার দু'পাশে থাকে খেজুরের গাছ। এখানে খেজুর গাছ ছিল তবে কেটে ফেলা হয়েছিল। অতি কষ্টে ভারতীয় ভদ্রলোকের অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। ভদ্রলোক অনুগ্রহ করে থাকবার বন্দোবস্ত করে দিলেন। ভদ্রলোকের কথার মাঝে প্রাদেশিক ভাব পুরামাত্রায় ছিল। এরূপ লোকের মাঝে প্রাদেশিক ভাব থাকা স্বাভাবিক। প্রাদেশিকতার কথা ভুলে গিয়ে বিশ্রাম করার জন্য শুয়ে পড়লাম, কারণ তখন দ্বিপ্রহরে রৌদ্র তাতিয়ে উঠেছিল।

বিকাল বেলা স্নান করে তাইগ্রীস নদীর তীরে গিয়ে মাত্র বসেছি, এমনি সময় একজন বাংগালী ভদ্রলোক জাল নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে এলেন। ভদ্রলোক বাংগালী মুসলমান। প্রথমবার জাল ফেলার পর মোটা মোটা প্রায় দশ-বারটা পুঁটি মাছ ধরা পড়ল। দ্বিতীয়বারে আরও বেশী। তীরে বসে আমি মাছ ধরা দেখছিলাম। লালচান্দ অফিস থেকে মাছ ধরা দেখে ডেকে বললেন—আমার বাড়িতে আজ একজন বাংগালী অতিথি আছেন, কটা মাছ দিয়ে যাবেন। বাংগালী ভদ্রলোক কথাটা শুনেই আরবী ভাষায় কি বললেন তা আমি বুঝলাম না, তন্ময় হয়ে মাছ ধরার দৃশ্যই দেখতে লাগলাম। ভদ্র-লোকের কাছে যে ব্যাগটি ছিল তা মাছে ভর্তি হবার পর তিনি নদীতীরের পথ ধরে চলে গেলেন, একটা মাছও দিয়ে গেলেন না। মাছগুলি বড়ই লোভনীয় ছিল, সেইজন্য কয়েকটি না দিয়ে যাবার জন্য আমার একটু রাগ হয়েছিল। বিকালবেলা যখন বের হয়ে যাব তখন লালচান্দ আমাকে ডেকে বললেন, বিকেলে আপনার নিমন্ত্রণ আছে, সত্বর চলে আসবেন।

সেদিন বিকালবেলা বেশিদূরে না গিয়ে নিকটস্থ একটি আর্মানী পাড়ার কাফেতে গিয়ে বসলাম। আরমানীরা দেখতে ইউরোপীয়দের মতই। কিন্তু তাদের কাফেতে কালো লোক গেলে কোন রূপ অভদ্র

ব্যবহার করে না। আরমানীরা আরব এবং ইরানীদের সংগে সদ্-ব্যবহার বজায় রাখতে বড়ই উৎসুক। আরবরাও আর্মানীদের বন্ধু বলেই ভাবে। এই আপনা আপনি ভাবের একটা কারণ আছে। উভয় জাতের মাঝেই তুরুক বিদ্বেষ প্রচুর। ভারতের লোক হয়ত ধারণাও করতে পারবে না, আরবগণ তুরুকদের মোটেই পছন্দ করে না। যদি সময় হয় তবে এ সম্বন্ধে এ বিষয়ে বিশদভাবে বলা হবে। শুধু এখানে এইটুকু বলে রাখলেই ভাল হবে, যখন জাতের মাঝে জাতীয় ভাব বিকশিত হয়, তখন ধর্মের বন্ধন কেটে গিয়ে শাসিত ও শাসকের সম্বন্ধ বড় হয়ে উঠে। একথা যেই অবজ্ঞা করবে তাকে বাতুল ছাড়া এ যুগে কোন পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে না।

রেঁস্তোরায় আরবী গান হবার পর আর্মানী গান আরম্ভ হল। তারপর শুরু হল এক রকমের তামাসা, যাকে ইউরোপীয় ধরণের নাচ বলা যেতে পারে। মুখোস পরে দুজন লোক দাঁড়িয়ে কতক্ষণ একটিং করে চলে যাবার পর একখানা থালা হাতে করে অন্য একজন লোক ষ্টেজ হতে নেমে সকলের কাছে থালাখানা এগিয়ে দিতে লাগল এবং যার যা ইচ্ছা থালাতে ফেলে দেবার পর সে চলে গেল। লক্ষ্য করে দেখলাম কেউ দশ ফিলিস এর বেশি দেয় নি। এতে করে এক বারেই দশ-বার শিলিংএর মত উঠল। আর্মানীদের রেঁস্তোরায় আরবরা আসে এবং বেশ টাকা খরচ করে।

আর্মানী রেঁস্তোরা হতে ফিরে এসে চাটগাঁয়ে ভদ্রলোকের বাড়িতে চললাম। বাড়িখানা একটি গলিতে অবস্থিত। বাগদাদে গলি থাকাটা সকলেই যেমন পছন্দ করে, আমিও তেমনি পছন্দ করি। দ্বিপ্রহরে রৌদ্রে যখন বড় পথে চলা অসম্ভব হয় তখন গলিপথে চলে বেশ আরাম পাওয়া যায়। রাত্রে গলিপথে চলা একটু কষ্টকর। সাথে লোক থাকায় গলিতে চলতে আমার মোটেই কষ্ট হয়নি। তবে লক্ষ্য করলাম, গলিপথ আরব্য রজনীব সমূহ পরিচয় দিয়ে থাকে।

দেশীয় ভদ্রলোকের বাড়ির সামনে এসে আমরা দাঁড়ালাম। ভদ্রলোক সদর দরজার কড়াতে দুবার নাড়া দিলেন। তারপর আর নাড়ালেন না। কতক্ষণ পর একটি লোক এসে দরজা খুলে দিয়ে এক দিকে বেরিয়ে পড়ল। আমরা ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। বাগদাদের প্রত্যেক বাড়ির সদর দরজা খোলার জন্য কড়া নাড়ার বিশিষ্ট নিয়ম আছে। কোন বাড়িতে দুবার, কোন বাড়িতে তিনবার কড়া নাড়াতে হয়। অপরিচিত লোক কড়া নাড়াতে প্রায়ই ভুল করে এবং সেজন্য কেউ দরজা খুলে দেয় না।

অতিথি আসলে নীচের তলায়ই খাবারের এবং থাকার বন্দোবস্ত হয়। আমাদের জন্যও নীচের তলায় খাবারের বন্দোবস্ত হয়েছিল। নিমন্ত্রিতের মাঝে আমিই বিদেশী আর সবাই ছিলেন আরব। চাটগাঁয়ে ভদ্রলোক আরবভয়ে ভীত ছিলেন, সেজন্য আমার কাছে এসে বললেন, খাবারের পূর্বে যেন বিস্‌মিল্লা বলে খেতে আরম্ভ করি। তিনি জানতেন না আমি আরবদের আচার-ব্যবহার বেশ ভালই জানতাম। আরবগণ বড়ই উদার। নামাজ পড় আর না পড়, বিস্‌মিল্লা বল আর না বল, তুমি মুসাফির এই পর্যন্ত জানলেই হল।

যে সকল ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই ইংলিশ জানতেন। চাটগাঁয়ের ভদ্রলোক ইংলিশ জানতেন না, তাতে আমার বেশ সুবিধা হয়েছিল। দেশ-বিদেশের নানা কথা বলে আমরা সময় কাটাতে লাগলাম। আসর বেশ জমে উঠছিল। আরাম করে মাছ ভাজা, মাছের তরকারী, অন্যান্য আরবী খাদ্য খেয়ে চলে এলাম। আমাকে পৌঁছে দেবার জন্য চাটগাঁয়ে ভদ্রলোক এসেছিলেন। পথে চলতে চলতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবু, আপনি মুসলমান নন, অথচ এরা আপনাকে আজ যে সম্মান দিল আজ পর্যন্ত স্থানীয় কোন ভারতীয়কে সেরূপ সম্মান দেয়নি।"

আমি বললাম—এখানে ধর্মের কথা আসতেই পারে না। এঁরা দুনিয়ার সংবাদ পাবার জন্য উৎসাহী ছিলেন, আমি তাঁদের সে বাসনা

পূর্ণ করেছি। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ আমাকে দেশ-বিদেশের সংবাদবাহক রূপেই ধরে নিয়েছেন, এর বেশী কিছুই নয়। দেখলেন না, এঁরাও আমার মত খেতে শুরু করেন এবং আমার মতই খাবার শেষ করলেন। যারা গড়ে তারা ভাংতে পারে ; যারা গড়ে না, অপরের গড়া বাড়িতে বাস করে, তাদের ভাংগার অধিকার থাকে না। যদি কখনও ভেংগে ফেলে তবে জরিমানা দেয়। আপনারও সেই অবস্থা। আরবগণ ইস্‌লাম ধর্মের নিয়ম-কানুন অবহেলা করতে সক্ষম হয়, কারণ তাদেরই পূর্বপুরুষ ইস্‌লাম ধর্মের গোড়াপত্তন করেছিলেন। আপনি হিন্দি, আপনি ইস্‌লাম ধর্ম মেনে চলবার অধিকার পেয়েছেন মাত্র, অবহেলা করা অথবা ইস্‌লাম ধর্মকে অবমাননা করার অধিকার আপনার নাই।

গত মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ ফৌজ বাগদাদে পৌঁছেই প্রচার করে, তারা আরবদেশ দখল করতে আসেনি, তুরুকদের নাগপাশ হতে মুক্ত করতে এসেছে। বেশ ভাল কথাই। আরবগণ তাতে সুখীই হল। তারা দেখতে পেল, রাজা ফয়জল হতে মামুলী চৌকিদার পর্যন্ত তাদেরই লোক সরকারী দপ্তরগুলি অধিকার করেছে। লিগ অফ-নেশনে তাদেরও নাম উঠে গেছে। তাদের রাষ্ট্রদূত নানা দেশে যাচ্ছে। আর চাই কি ? কতকগুলি লোক এতেই ভুলে গেল। যারা এতেই ভুলে গেল তারাই হিন্দিদের প্রতি রক্ত চক্ষু করে বলতে লাগল, "বের আমাদের দেশ থেকে।" ফাঁকা স্বাধীনতা পেয়ে যারা মস্‌গুল হয়ে উঠেছিল, তারা দেখলে শক্তিশালী বৃটিশের সংগে কথা বলা চলে না, অতএব হিন্দিদের বয়কট করাই সমূহ দরকার। বয়কট আরম্ভ হল। অনেক হিন্দি ক্ষতিগ্রস্থ হল। অনেক হিন্দি স্বেচ্ছায় ইরাক ছেড়ে দেশে চলে এল। যারা দেশে চলে এল তারা প্রায়ই মুসলমান। দেশে এসে আরবদের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলল না, সেজন্য দেশবাসী জানল না কেন তারা "বসরা" ছেড়ে চলে এসেছে।

বৃটিশ স্বার্থ, বৃটিশ কখনও পরিত্যাগ করে না। বৃটিশ বলেছিল, আরবদের স্বাধীনতা দেবে, লোক দেখানো স্বাধীনতা ইরাকীদের দিয়েও ছিল, কিন্তু নিজের স্বার্থ সোল আনা বজায় রাখল। বস্‌রা বাগদাদ রেল লাইন এবং মুসলের তেলের খনিতে বৃটিশ আরও বেশ করে চেপে বসল। রাজা ফয়জলকে বৃটিশই সিংহাসনে বসিয়েছিল, অতএব তাঁর এ সম্বন্ধে কোন কথা বলবার অধিকার ছিল না। অপ্রীতিকর কাজ লোক করতে চায়না, বৃটিশও তা পছন্দ করে না, সেজন্য রাজা ফয়জলকে দিয়ে দেশ শাসন করান হচ্ছিল এবং মুসলের তেলের খনি হতে বিদেশে তেল পাঠিয়ে মোটা টাকা রোজগার এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধের বিশিষ্ট উপকরণ বেন্‌জিন্ পাহারা দেওয়া হচ্ছিল। ইরাকের স্বাধীনতার নমুনা এ পর্যন্তই বলা যেতে পারে।

বাগদাদে পৌঁছার পর থেকেই আমি আর্য-সমাজের দ্বারওয়ানের সংগে প্রায়ই সাক্ষাৎ করতাম এবং যে সকল কথা ভাল করে বুঝতাম না তার মীমাংসা সেই লোকটিই করে দিত। ইরাকে তখনকার দিনে এন্‌টি-হিন্দি ভাব বেশ ভাল করে জেগে উঠেছিল। ইরাকীরা হিন্দি দেখলেই কেঁপে উঠত। আমরাও অনেক কিছু দেখলেই কেঁপে উঠি। আমরা বলি "উড়ে" আর "মেড়ো" আমাদের ফতুর করল, কিন্তু এটা ভাল করে জানি যারা আমাদের ফতুর করেছে তাদের বিরুদ্ধে যদি একটা কথা বলি তবে মুখে একটা দাঁতও থাকবে না, ঠিক সেইরূপ আরবরা হিন্দিদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিল।

বাগদাদে একটি হিন্দি রেঁস্তোরা ছিল। তার মালিক ছিল একজন শিখ। শিখ লোকটি চিন্তা করে দেখল সে অমুসলমান বলেই আরবরা তার রেঁস্তোরায় আসে না। সেজন্য রেঁস্তোরায় একজন পান্‌জাবী মুসলমানের কাছে বিক্রি করে দিল। পান্‌জাবী মুসলমান পাগড়ি পরিত্যাগ করে ফেজ মাথায় দিয়ে রেঁস্তোরায় বসলেন। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন, ভারতীয় মুসলমানকে আরব মুসলমান নেক নজরে দেখবে। কিন্তু ফল একটুও ভাল হল না। আরব গ্রাহক আর

এল না, উপরন্তু হিন্দি রেঁস্তোরা যাতে উঠে যায়, সেজন্য ঘরের মালিককে সকলে নানা কথা বলে ভয় দেখাতে লাগল। ঘরের মালিক হিন্দিকে ঘর পরিত্যাগ করতে নোটিশ দিল। কয়েক দিনের মাঝেই হিন্দি রেঁস্তোরা উঠিয়ে দিয়ে কোথায় চলে গেল।

বাংগালী হিন্দুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য অনেক বাংগালী হিন্দু দোকানের সামনে "বাংগালী হিন্দুর বিড়ির দোকান", "হিন্দুর দপ্তরীখানা" এসব কথা লিখে সাইন বোর্ড টাংগিয়ে দেয়। একদিন বাগদাদের একটা ছোট গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হল পেছন দিক থেকে কে যেন আমাকে ডাকছে। কে ডাকছে জানবার জন্য মুখ ফেরালাম। দেখলাম সত্যিই একজন লোক আমাকে ডাকছে। সাইকেল ফেরালাম এবং লোকটির কাছে এলাম। লোকটি জাতে গুজরাতী, অবয়বে খাঁটি দ্রাবিড়, ধর্মে সিয়া মুসলমান। লোকটি আমাকে তার দোকানে বসাল এবং একখানা ছোট কাঁচের থালায় কতকটা মাখন এবং চিনি খেতে দিয়ে বলল, "তমে মুসাফির তা আমি জানি।" গুজরাতী ভাষায় তুমি অথবা আপনি ব্যবহার হয় না, "তমে" ব্যবহার হয়।

গুজরাতী লোকটি দরজার সামনের বোর্ডটির দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বলল, এদেশে ধর্ম দিয়ে জাত হয় না, ভাষা দিয়ে জাত হয়। আমি একজন সিয়া একথাটা সাইনবোর্ডে পরিষ্কার করে লেখা আছে। এদিকে যত লোক বাস করছে তারা সকলেই সিয়া, ভাবছিলাম এরা সকলেই আমাদের দোকান থেকে মাখন কিনে সাহায্য করবে, কিন্তু কেউ আমার দোকানে আসেনা, এমন কি কথাও বলেনা। ভাবছি এবার দেশে গিয়ে ব্যবসা করব, অপরের দেশে ব্যবসা করা যে কি বিপজ্জনক তা এবার বেশ ভাল করে বুঝেছি। লোকটি অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে ভেবেছিল এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলব, কিন্তু আমার মন লোকটির কথা ভুলে গিয়েছিল, আমি ভাবছিলাম হিন্দুদের বর্জনশীল মনোবৃত্তির কথা।

হিন্দুরা যদি বর্জনশীল না হতো তবে এই দরিদ্র গুজরাতী বাধ্য হয়ে অপরকে আপন বলতে এসে এই বিপদে পড়ত না। প্রকাশ্যে মাখন ব্যবসায়ীকে বললাম—বিদেশ বিদেশই, অতএব দুঃখ করে আর লাভ কি, দেশে গিয়ে ব্যবসা করাই ভাল। আমার কথায় লোকটির মন উঠল না; সে চীৎকার করে তখনকার দিনের জাতীয় স্লোগান "বন্দে মাতরম" বলতে লাগল। আরবরা বুঝল এ লোকটারও এ জাতীয় স্লোগান আছে। আমি আর বেশীক্ষণ মাখনের দোকানে বসলাম না, ম্যন রোড ধরে চলে এলাম।

জাপানী মানচুরিয়া দখল করে মানচুদের স্বাধীন করেছিল। কিন্তু মানচুদের প্রত্যেকটি অপিসে একজন করে জাপানী কর্মকর্তা রাখতে বাধ্য করেছে। এটা জাপানের মস্ত বড় ভুল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সেরূপ ভুল করে না। তারা এখানে প্রত্যেকটি অপিসে তাদের নিজের লোক না বসিয়ে এমনি করে শাসন করছিল যা সাধারণ লোক বুঝতেও পারত না। এখানে একটি বৃটিশ এম্বেসী অপিস্ আছে। সেই অপিসে বসেই রশি টানা হতো আর প্রত্যেকটি আরব অফিসার সেই রশির টানে টানে উঠত আর বসত: কেউ বুঝত না রাজা ফয়জলও হেনরী পুঁইএর মত একজন পাপেট রাজা। এখানেই বৃটিশ সাম্রাজ্যনীতির পরিপক্কতা দেখা যায় এবং জাপানী সাম্রাজ্যনীতির ছেলেমানুষীও অনুভব হয়। আমি পর্যটক মাত্র, এত গভীর তথ্য সংগ্রহ করা আমার কাজ নয়, তবে যদি কেউ সংবাদ এনে কানের কাছে দেয়, তবে তা শুনতে দোষ কি?

দোষ-গুণের অতীত হয়ে বাগদাদের একমাত্র দৈনিক ইংলিশ সংবাদপত্র অপিসে গিয়েছিলাম। সেই সংবাদপত্রে আমার একটি বিবৃতিও প্রকাশ হয়েছিল, তবে সে বিবৃতি এতই বিশ্রী হয়েছিল যে আমার নিজেরই তা পড়তে ভাল লাগছিল না। এতে আমার বেশ লাভ হয়েছিল। শিক্ষিত আরবমহল বুঝতে পেরেছিল, আমি সত্যিই স্বাধীনভাবে বিদেশ ভ্রমণ করতে বের হয়েছি। আমার সম্বন্ধে সেই

সংবাদটি বের হবার পর থেকেই শিক্ষিত আরব আমাকে খুঁজে বের করত এবং বিদেশের সংবাদ সংগ্রহ করত।

বাগদাদ পুরাতন শহর। অনেকেই এই শহর সম্বন্ধে বড় বড় বই লিখেছেন। আমার চক্ষে কিন্তু বাগদাদের রূপ গরিমা কিছুই ধরা পড়ল না। বড় বড় মসজিদের মিনারগুলি দূর থেকে দেখতে বড়ই সুন্দর লাগত, কিন্তু যখন বড় বড় মসজিদের চারদিকে দরিদ্র লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখতাম, তখন বড় বড় মিনারের কথা ভুলে গিয়ে দারিদ্র্যের কথাই ভাবতাম। আমি ভাবতাম অনেক কথাই, তবে সে ভাবনার কোন মূল্য ছিল না। মাঝে মাঝে পরিশ্রান্ত হয়ে বড় বড় "কাওয়া" তে গিয়ে চুপ করে বসে থাকতাম। এখানে কাফে ঘরের অপর নাম "কাওয়া"। দু' এক দিন কাওয়াও খেয়েছি। বাগদাদের আরবরা কাফিতে চা অথবা চিনি ব্যবহার করে না। সেজন্য জিনিষটি ভয়ানক কটু হয়। যার কাওয়া খেয়ে অভ্যাস নাই সে তা খেতে পারে না। আমি কিন্তু কাওয়াতে চিনি মিশিয়ে দিতে বলতাম। বয় আমার কথা মতে চিনি মিশিয়ে দেবার জন্য বেশী পয়সা চার্জ করত না।

বাগদাদে ইউরোপের নানা জাতের লোক দেখতে পাওয়া যায়। এখানে তারা ব্যবসা করতে আসে। নবাগতদের মাঝে ইউরোপীয় ইহুদীদের সংখ্যাই বেশি। ইহুদীরা অতি কম কথা বলে এবং ব্যবসায়ে পটু। এখানে ইহুদী এবং ইণ্ডিয়ানদের একই অবস্থা। এদের কেউ দেখতে পারে না। উভয় জাতের লোকেই বৃটীশের ধামাধরা এবং ইহধামকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়ে মরণের পর কল্পনার স্বর্গে গিয়ে বাস করবে এই ধারণা পোষণ করে। ইহুদী শিক্ষিত আর ভারতবাসী অশিক্ষিত। এখানে শিক্ষিতে এবং অশিক্ষিতে কোন প্রভেদ দেখলাম না। অশিক্ষিত আরব নিজের দেশের জন্য বিনা দ্বিধায় প্রাণ দিতে এগিয়ে আসে বলেই পৃথিবীর লোক আরবকেই আরবের বাসিন্দা বলে মেনে নিয়েছে, কিন্তু

ইহুদীকে আরবের বাসিন্দা বলে মেনে নিতে কেউ রাজি নয়। তবে এখানে নতুন ধরণের কতকগুলি ইহুদীর সংগে আমার দেখা হয়। তারা বাস্তবিকই শিক্ষিত এবং বৃটিশের অনুগ্রহপ্রার্থী নয়। তারা এসেছেন জার্মানী হতে পালিয়ে। তারা জার্মানীতেই ফিরে যেতে চায়, প্যালেষ্টাইন-এ বৃটিশের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে থাকতে রাজি নয়। কখন কি করে তারা জার্মানীতে ফিরে যেতে সক্ষম হবে জিজ্ঞাসা করায তারা বলেছিল, "যেদিন বৃটিশ এজেণ্ট হিটলার জার্মানী ছাড়বে, সে দিন তারা জার্মানীতে ফিরে যাবে"। রাষ্ট্রনীতি বড়ই গভীর। বৃটিশের এজেণ্ট হিটলার কথাটা তখন আমার মনে একটা বাতুলের প্রলাপই মনে হয়েছিল। কিন্তু যেদিন চেকরা হাত উঠাল সেদিন মনে করলাম হিটলার সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের এজেণ্ট না হউন মিত্র ত বটেই। তবে কালস্য কুটিলা গতি।

বাগদাদে আরমানীদের একটি পল্টন হয়েছে। সেই পল্টনটি দেখবার বড়ই ইচ্ছা হয়েছিল। একদিন হিনাইডি নামক স্থানে বাসে করে গিয়েছিলাম। সেখানে অনেক ভারতীয় কেরানীও থাকতেন। সর্বপ্রথম ভারতীয় কেরানীদের সংগে দেখা করলাম। ভারতীয় কেরানীদের সংগে দেখা করার সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। একজন ভারতীর কেরানী বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে যাবেন এই মনস্থ করে উভয়ে মিলে তাঁর বন্ধুর বাড়িতে আসি। বন্ধুর দরজার কাছে এসে আমরা উভয়েই দাঁড়াতে বাধ্য হই, কারণ ঘরের ভেতর তখন স্বামী স্ত্রীতে বেশ ঝগড়া চলেছিল। স্বামী স্ত্রী বাংলাতে কথা বলছিলেন। স্ত্রী বলছিলেন, "ব্যাবিলোনে যা আছে পৃথিবীর অন্যত্র তেমন সুন্দর দেখার কিছুই নাই।" স্বামী বলছিলেন, "ব্যাবিলোনে ঘোড়ার ডিম আছে।" ভদ্রলোকের স্ত্রীর কথা শুনে সে অশ্বডিম্ব কেমনতর তা দেখবার প্রবৃত্তি হয়। ভদ্রলোকের স্ত্রীর সংগে সেদিন দেখা হয়েছিল। কিন্তু ব্যাবিলোন সম্বন্ধে কোন কথা বলিনি।

কেরানীদের কাছে বিদায় নিয়ে আর্মানীদের ব্যারাকে যাই। ব্যারাকগুলি ইণ্ডিয়ান ব্যারাকের মতই। যারা এই ব্যারাকে থাকে, তাদের দিকে তাকালে মনে হয় তাদের মনে দুঃখের একটা ছাপ মারা রয়েছে। তুরুকরা আর্মানীদের ওপর অত্যাচার করে তাদের দেশ হতে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আর্মানীস্থানের যে অংশটা সোভিয়েটের অন্তর্গত ছিল এবং সেখানে যারা বাস করত, তাদের মাঝেও অনেকেই ভগবান এবং জারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বৃটিশের শরণাপন্ন হয়েছিল। এই দু' রকমের পলাতকদের নিয়েই গড়ে উঠেছিল আর্মানী পল্টন।

বস্‌রার পথে

বাগদাদে ফিরে এসে পরের দিন ফেলুজাতে গিয়াছিলাম। ফেলুজা ছোট শহর। ফেলুজা যাবার পথটি সুন্দর ছিল। পথের দুদিকে কংকর ভূমি ছিল। মরুভূমির বালুকণা পথ বন্ধ করে রাখেনি। ফেলুজাতে পথের শেষ হয়েছে। তারপরই আরম্ভ হয়েছে মরুভূমি। মরুভূমিতে সাইকেল চালানো অসম্ভব দেখে ফিরে আস্‌ছিলাম। ফেলুজা সম্বন্ধে পরবর্তী ঘটনার সংযোগ রয়েছে, সেজন্য ফেলুজার কথা পরেই বলা হবে।

ফেলুজা থেকে ফিরে এসে লালচান্দের বাড়ীতে থাকা উপযুক্ত হবেনা ভেবে ম্যান্‌ রোডের উপর অবস্থিত একটি লজিং হাউসে দৈনিক একশত ফিলিসে একখানে রুম ভাড়া করলাম। রুমখানা ইউরোপীয় ধরণে সজ্জিত এবং যাঁরা লজিং হাউসে থাকতেন তাঁরা সকলেই ইউরোপীয়। সংগী পেয়ে আরব দেশের অনেক কথাই অবগত হয়েছিলাম। পুস্তকের কলেবর বেড়ে যাবে বলে অতি দরকারী কথাও পরিত্যাগ করতে হল।

কয়েকদিন লজিং হাউসে থাকবার সময় কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করলাম যার একটি মাত্র নমুনা দিয়েই বাগদাদের কথা শেষ করব। বিদেশে ভারতীয় সেপাই যায় যুদ্ধ করতে। যুদ্ধ কথাটা বীরের কাজ, যদিও এক শ্রেণীর বিদেশী আমাকে সেজন্য দুকথা শুনাতে ছাড়েন নি। প্রতিবাদে আমিও দু'চার কথা এ সম্বন্ধে বলেছিলাম। কিন্তু কথা হলো যখনই পথে বের হতাম, তখনই কতকগুলি দরজী আমার পেছন নিত। তারা দূরে থেকেই আমার পোশাকের মাপ নিত। তবে এরূপ ভাবে প্রত্যেক দিন দূরে থেকে পোশাকের মাপ নেওয়াটা আমি মোটেই পছন্দ করতাম না বলে একদিন একটা দরজীকে ধরে

একটা মাত্র চড় দিয়েছিলাম। সে সুদূর পশ্চিম দেশে এসেও আমাকে বাঙ্গালী বলেই সম্বোধন করত। যারা দূরে থেকে পোশাকের মাপ নেয়, তাদের মুখ হতে যে কোন কথা বের হলেও দোষের হয় না। এদের পরিচয় একটু ঘুরিয়ে বলা হ'ল।

উপদেশ দেবার লোকের অভাব নাই। একদিন কয়েকজন ভারতীয় ভদ্রলোক আমাকে বললেন, "আপনার ব্যাবিলোন দেখা উচিত।" অপরের উপদেশ আমি শুনতাম, তবে সকল সময় উপদেশ মত কাজ করতাম না। আমি যখন আনমনে কি ভাবছিলাম তখন একজন কেরানী বলছিলেন, তিনি আমার জন্য রেলের ফ্রি টিকিটের বন্দোবস্ত করে দেবেন। তার কথা শুনে সুখী হয়েছিলাম। কেরানী মহাশয় চটপট একখানা দরখাস্ত আমার নামে লিখে এবং নিজের কাছ থেকে একখানা ষ্ট্যাম্প লাগিয়ে পত্রখানা আমার হাতে দিয়ে বলছিলেন, "পত্রখানা লেখার শ্রম যদি সার্থক হয় তবে ভ্রমণের ফল কিছুটা আমিও পাব।"

কথাটার জবাব দেইনি, চুপ করে ভাবলাম, "যে জাতের শিক্ষিত লোক পাপপুণ্যের এত হিসাব রাখে, দেবার বেলাও পাবার জন্য লোভের বশীভূত হয়, সে জাত কত নীচ স্তরে নেমেছে তা ভেবে ঠিক করাও কঠিন। কেরানীদের হয়ত এজেণ্ট দয়া করতে পারে, আমি ত তাদের মত নই, আমি চাই আমার দেশও স্বাধীন হয়ে বৃটিশের মত শক্তিশালী জাতে পরিণত হ'ক, আমার মত লোককে বৃটিশ এজেণ্ট কোন মতেই দয়া কবতে পারেনা, এতে তার স্বার্থে আঘাত লাগবে নিশ্চয়ই। যা ভেবেছিলাম, তাই হল। দরখাস্ত নামঞ্জুর হ'ল। কেরানীর দলের কিন্তু এতে চোখ খুলল না, তারা বলল হয়ত দরখাস্তে কোন ভুল ছিল। এদের কথা শুনে হাসব কি কাঁদব তা ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না।

যাতে বাধা পাওয়া যায় সে কাজ করতে জেদ বাড়ে এবং সে কাজ যদি আমি করতে সক্ষম হই তবে তাড়াতাড়ি করে ফেলি।

বাগদাদ হতে বস্‌রার ভাড়া এমন কিছু ছিলনা যার জন্য আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হ'ত। এজেন্টের উত্তর পাবার পরই ষ্টেশনে গিয়ে একখানা রিটার্ণ টিকিট কিনে লজিং হাউসে যখন ফিরছিলাম তখন লক্ষ্ণৌর একটি লোকের সংগে সাক্ষাৎ হয়। লোকটি ছিল আমার পরিচিত। তোরহানে আমার সংগে দেখা হয়। তোরহানে থাকার সময়ই তাঁর বিদেশের মুসলমান প্রীতি শুকিয়ে যায়, কারণ তিনিও ছিলেন আমারই মত ভিখারী। ভিক্ষা করে তীর্থ ভ্রমণ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ইরানীরা তাঁকে এক পয়সা দিয়েও সাহায্য করেনি, বরং তাঁকে ভিখারী আইনে ফেলার জন্যই চেষ্টা করছিল। সেখানে হিন্দিরাই তাঁকে সাহায্য করে বাগদাদ পাঠিয়েছিল, এখানে এসেও তিনি হিন্দির সাহায্যেই কারবালা যাবার পাথেয় যোগাড় করেছিলেন। আমার সংগে দেখা হবার পরই তাঁর প্রাণে যেন নব জীবনের সূচনা হল। তিনি আমার একই সংগে কারবালা যাবেন ঠিক করলেন। পরের দিন রেল-ষ্টেশনে আমরা চার জনে একই কম্‌পার্টমেণ্টে উঠলাম। সাথীর সংগে তাঁর পুত্র এবং স্ত্রী ছিলেন।

বাগদাদ রেল-ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য ছিল না। এদিকের লোক পারতে গাড়িতে উঠেনা। উট, ঘোড়া এসবেই তারা চড়ে বেশি। আমার সাথী তিন জন গাড়িতে বসেই নানারূপ মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন। এতে আমি একটুও বিরক্ত হলাম না। গয়া কাশী যাবার সময় হিন্দুরাও কত মন্ত্র পাঠ করে তার হিসাব দেওয়া কষ্টকর। হিন্দুদের মন্ত্র পড়া যদি সহ্য করতে পারি, তবে মুসলমানের মন্ত্র পড়া সহ্য করতে পারব না কেন?

গাড়ি ছাড়বার পূর্বে আমি ষ্টল থেকে দুখানা ইংলিশ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র কিনে তাই পড়তে লাগলাম। আমার সাথীরা তীর্থযাত্রী তা একজন আরব বুঝতে পেরে আমাদের কম্পার্টমেণ্টে এসে বসল। কিন্তু আমাকে দেখে লোকটি যেন একটু বিরক্ত হল। লোকটি বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানী ভাষায় কারবালার মাহাত্ম্য আমার সাথীদের বলতে লাগল।

আমি তাতে একটুও অস্বস্তি অনুভব করিনি, কারণ গয়া-কাশীর মাহাত্ম্য যদি হজম করতে পারি তবে কারবালার মাহাত্ম্য কেন সহ্য করতে পারব না? আমিও কারবালা-মাহাত্ম্য মন দিয়েই শুনতে লাগলাম। এতে আরব লোকটির আমার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ভাব অপসরণ হল। আমিও কারবালা-যাত্রী কি না তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি অন্য ধর্মের লোক শুনে তাঁর মনে কোনরূপ বিকার এল না। কথা প্রসংগে ধর্মযাজক আমায় জানিয়ে দিলেন, তাঁদের দেশের খৃষ্টানরা তাঁদের কাছে অনেক সময় ভিক্ষা করতে আসে। তাঁরা খৃষ্টানদের বিমুখ করেন না এবং জেরুজালেম যাবার জন্য উৎসাহিত করেন। ধর্মযাজককে পেয়ে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম এবং সাথীদের ধর্মযাজকের সংগ নিবার জন্য অনুরোধ করলাম। এতে আমার সাথীরা রাজী হলেন।

আরব দেশ মরুময়। মরুভূমিতে চলে উট। আরবে ঘোড়াও আছে, ঘোড়ার সুনামও আছে। তা বলে কি হয়। আরব দেশের রেলগাড়ী 'হর্স পাওয়ারে' চলে না, 'উষ্ট্র পাওয়ারে' চলে। গাড়ি 'উষ্ট্র পাওয়ারে' উষ্ট্র গতিতে ঘণ্টায় বার মাইল করে চলছিল। উট চড়া আমাব অভ্যাস ছিল, তাই প্রথমত কোন কষ্ট হচ্ছিল না।' কয়েক ঘণ্টা বসবার পর কোমরে বেশ ব্যথা হতে লাগল। প্রোগ্রাম পরিবর্তন করতে বাধ্য হলাম, ঠিক করলাম হিল্লাতে গিয়ে নেমে যাব এবং ব্যাবিলন দেখে বস্রায় রওয়ানা হব।

আমার কোমরে তখন বেশ ব্যথা হচ্ছিল। গাড়িটা একটি ষ্টেশনে থামল। গাড়ি হতে নেমে একটু পায়চারী করে যখন ফের গাড়িতে উঠতে যাব, তখন আমাদের গাড়িতে একজন ভারতীয় প্যান ইসলামী প্রচারক উঠলেন। এই প্রচারকের বাড়ি মুরাদাবাদে এবং তিনি সুন্নি শ্রেণীর লোক। আমার সংগে যাঁরা কারবালা যাচ্ছিলেন তাঁরা হলেন সিয়া, লক্ষ্ণৌ তাঁদের বাড়ি। সিয়া এবং সুন্নীতে যে এত গরমিল রয়েছে—বিশেষ করে ভারতীয় মুসলমানের মাঝে, তা

আমার জানা ছিল না ; বিদেশে এসেও মুরাদাবাদের লোক লক্ষ্ণৌর লোকের সংগে বেশিক্ষণ কথা বললেন না।

লক্ষ্ণৌর লোকটি বড়ই রসিক। তিনি হঠাৎ বলে ফেললেন, "আমার সংগের ভদ্রলোক পূর্বে হিন্দু ছিলেন, এদেশে এসে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন।" কথাটা শুনামাত্র লোকটি চীৎকার করে বলে উঠল, "দেখি আপনার ধর্মান্তরের সারটিফিকেট।" সারটিফিকেট সম্বন্ধে নীরব থাকায় তিনি ফের বললেন, "আপনি বম্বেতে গিয়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করুন, তবুও খৃষ্টান থাকবেন না। ইরাকের রাজাও একটা অপদার্থ লোক। রাজা যে আইন করেছে সে আইনমতে এক বৎসরের মাঝে ধর্মান্তর করা সম্ভব হয় না, এই আইন বৃটিশই ইরাকের রাজাকে দিয়ে করিয়েছে। সুখের বিষয় আপনি বম্বে যাচ্ছেন, সেখানে ধর্মান্তর করতে আপনার কোন কষ্ট হবে না।" তিনি আরও বললেন, "বৃটিশই রাজা ফয়জলকে ইরাকের সিংহাসনে বসিয়েছিল, এজন্য রাজা ফয়জল খৃষ্টানদের অনেক সুযোগ এবং সুবিধা দিয়ে গেছেন।"

আমি নির্বাক হয়ে সকল কথাই শুনছিলাম। সিয়া-সাথীও কথা না বাড়িয়ে তাঁর ধর্মযাজকের কাছে কারবালার কথা শুনতে আরম্ভ করলেন। এরই মাঝে গাড়ি একটি ষ্টেশনে থামল। প্যান-ইস্লামের প্রচারক গাড়ি হতে নেমে ষ্টেশনের দিকে যাবার পূর্বে আমাকে ইংগিতে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি কারবালা যাচ্ছেন?" বললাম, "ব্যাবিলন যাচ্ছি।" তিনি এতে আনন্দিত হয়ে বললেন— "হিল্লাতে একজন বাংগালী মুসলমান আছেন, তাঁর বাড়ীতে গিয়ে থাকবেন, আমি এখনই তাঁকে তার করে জানাব। আপনার নামটা কি বলুন ত?" আমার নাম শুনে ভদ্রলোকের ভুল ভাংগল। তিনি আমাকে প্রকাশ্যেই বললেন "আপনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন এটা তবে মিথ্যা কথা?" "আমি ত ধর্ম সম্বন্ধে কোন কথাই বলিনি, আপনারাই কথা বলেছেন; আমি মাত্র আপনাদের কথা শুনেছি।" ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত মনে বিদায় নিলেন।

ইরাকে পৌঁছার পরই শুনেছিলাম—ইরাকে ধর্ম পরিবর্তন করার একটা রোগ এসেছে ; লোক ক্রমেই ধর্ম বদলাচ্ছে। যারা একটু শিক্ষিত তারাই বেশীর ভাগ ধর্ম বদলাচ্ছিল। এতে কতকগুলি লোক কেঁপে উঠছিল। যারা এই পরিবর্তনে কেঁপে উঠছিল তারা রাজদ্বারে আশ্রয় নেয়। ফলে একটি নূতন আইনের জন্ম হয়। সে আইন কিরূপ তাই বলছি। "যদি কেউ নিজের ধর্ম বদল করতে ইচ্ছা করে তবে তাকে ইরাকের স্বরাষ্ট্র-সচিবের কাছে দরখাস্ত করে জানাতে হবে যে, সে তার পুরাতন ধর্ম বদলিয়ে নূতন ধর্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। স্বরাষ্ট্র-সচিব আবেদন পাওয়ামাত্র আবেদনকারীর কাছে তার পুরাতন ধর্মের একজন ধর্মযাজক পাঠিয়ে দেন এবং সেই ধর্মের মহিমা ধর্মযাজকের কাছে ছয় মাস পর্যন্ত আবেদনকারীর শুনতে হয়। এতেও যদি আবেদনকারীর মনের পরিবর্তন না হয়, তবে আরও ছয় মাস দেওয়া হয় চিন্তা করে মন ঠিক করার জন্য। তারপরও যদি লোকটা ধর্ম বদলাতে চায়, তবে তাকে ধর্মান্তরের সারটিফিকেট দেওয়া হয়।"

ধর্ম পরিবর্তনের গোড়ায় দুটি কারণ ছিল। তাতে স্বর্গে যাবার সোজা টিকিট কেনার কোন লোভই ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকাতে ইমিগ্রেণ্ট হিসাবে আরমানীরা যেতে পারত এবং এখনও যায়। দক্ষিণ আফ্রিকাতে যে সকল আরমানী যেত, তারা স্থলপথেই যাওয়া-আসা করত। আরমানীরা খৃষ্টধর্মাবলম্বী। আরবদের মাঝেও খৃষ্টান আছে। তাদের সংখ্যা নগণ্য এবং তারা বিদেশে মোটেই যেতে চায় না। মুসলমান আরব সাহসী ও বিদেশে যেতে উৎসুক। মুসলমান আরবদের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার দরজা বন্ধ। মুসলমান আরবগণ ভাল করেই দক্ষিণ আফ্রিকার ধনরত্নের সংবাদ জানত। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ আফ্রিকা যে কোন ইউরোপীয় দেশ হতে মজুরী বেশি দেয়, সে খবরটাও তাদের জানা ছিল। কিন্তু এরূপ সুন্দর দেশে আরবের প্রবেশ নিষেধ অথচ আরমানীরা বেশ আরাম করেই

সে দেশে গিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করে। এরূপ সুখ এবং সুবিধা পেতে হলে ধর্মান্তর ছাড়া আর উপায় ছিল না। সেজন্য শিক্ষিত আরবদের মাঝে কেউ কেউ ধর্ম বদলি করে আর্মানীদের সংগে দক্ষিণ আফ্রিকাতে যেতে সক্ষম হয়েছিল। সেরূপ আরবের সংগে আমার জোহেন্সবার্গে দেখাও হয়েছে।

এই পৃথিবীতে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যার সংবাদ আমরা রাখিনা অথবা সে সম্বন্ধে কোন সংবাদই পাইনি। পূর্বকালে যখন স্পেনিশরা দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অন্যান্য দেশে গিয়ে রাজ্য স্থাপন করত, তখন তারা প্রটেষ্টাণ্টদের নিয়ে যেতনা, রোমান ক্যাথলিকদেরই তারা বিদেশে নিয়ে যেত। স্পেনিশ্ রাজ্যে যাতে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম প্রচার না হয় সে উদ্দেশ্যেই তারা এরূপ করত।

নানা চিন্তায় মন বিব্রত ছিল। সেইজন্য বাইরের দিকে চেয়ে থেকেও বাইরের কিছুই দেখছিলাম না। হঠাৎ দেখলাম সন্ধ্যার ছায়া মরুভূমির উপর পড়েছে। দুদিকের বালুকণা আপনি রাতের আলোয় চকমক করছে। রাত যদিও অন্ধকার, তবুও মনে হচ্ছিল আঁধার তত নাই। আঁধারে আলো যদি দেখতে হয় তবে মরুভূমিতেই তা দেখা যায়। আঁধারে আলো অনেকক্ষণ দেখলাম, তারপর চোখ বুজে এল।

রাত তখন দুটা হয়েছে। গাড়ি হিল্লা ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। গাড়ি হতে নামার পরই একজন ভদ্রলোক আমার কাছে এসে বললেন—'আমিই এখানকার ষ্টেশন-মাষ্টার, চলুন আমার সংগে।' ষ্টেশন মাষ্টার বাংগালী। অদূরে টেবিলে কয়েকজন আরব ভদ্রলোক কাওয়া খাচ্ছিলেন। ষ্টেশন-মাষ্টার আমাকে তাঁদের সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আরব ভদ্রলোকেরা সর্বপ্রথম ব্যাবিলন সম্বন্ধে অনেকগুলি পৌরাণিক কথা আমাকে বলার পর আমি তাঁদের বললাম, "পৌরাণিক কথা প্রায়ই বানানো, অতএব ব্যাবিলন সম্বন্ধে পৌরাণিক কথার ওপর আমি মোটেই গুরুত্ব দেবনা।"

আমার কথা শেষ হবার পরই একজন দাঁড়িয়ে বললেন—"তবে আপনি রামায়ণ মহাভারত এসবের প্রতিও কোন আস্থা নিশ্চয়ই রাখেন না।" এরূপ প্রশ্নের পেছনে থাকে আক্রোশ। অপরের কিছুকে খারাপ বলে নিজের বিষয়কে যারা ভাল বলে তাদেরই এরূপ জবাব পেতে হয়। দুঃখের বিষয় এরূপ প্রশ্ন করা তাদের ভুল হয়েছিল। আমি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম। জবাবে বলে-ছিলাম—আস্থা আমার কিছুতেই নাই। রামায়ণ আদিযুগের একখানা পৌরাণিক বই। পুরান মানেই হল গল্প। গল্প সত্যও হয় মিথ্যাও হয়। রামায়ণ সত্য কি মিথ্যা তা জেনে আমাদের দরকার নাই, তবে রাম বলে একজন লোক ছিলেন। রামকে উপলক্ষ্য করে তখনকার অবস্থা রামায়ণে বলা হয়েছে মাত্র। রামায়ণে অনুধাবন করার অনেক বিষয় আছে। তবে তখনকার দিনে, রাম যে গোষ্ঠির লোক ছিলেন সেই সমাজে হাল-চাষ প্রচলন মাত্র আরম্ভ হয়েছিল, তাই আমি রামায়ণ পড়ে বুঝেছি ; এর বেশি কিছুই নয়।

আরব দেশের কতকগুলি লোকের রুশভীতি প্রবলরূপেই দেখা দিয়েছিল।

শ্রোতারা যখন দেখলেন, রামায়ণের আজগুবি গল্পগুলিতে আমি গুরুত্ব দিচ্ছিনা, তখন রামায়ণ সত্য ঘটনা, রামায়ণে একটি অক্ষরও বাজে লেখা হয়নি বলে আমাকে বুঝাতে লাগলেন। যাদের মাঝে জিনিষ আছে তারাই অপরের বাজেকেও ভাল বলে ঘরে রাখতে অনুরোধ করে। রামায়ণের মাঝে যে সকল বাজে কথা অর্থাৎ বাহুল্য আছে তা পরিত্যাগ করতে হতো।

কথাপ্রসংগে একজন আরব বললেন, "আপনাদের দেশে সোভিয়েট-রুশ সম্বন্ধে কিরূপ প্রপোগাণ্ডা হয় তা আমরা জানিনা। আমাদের দেশে বিদেশী প্রচারক দ্বারা নানারূপ কথা শুনান হয়, আপনি অনেক দেশে বেড়িয়ে আসছেন, সেজন্যই আপনার কাছে

রুশেদের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করব। প্রচারকগণ বলেছেন, 'প্রাইভেট সম্পত্তি বর্তমানে রুশদেশে আর কারো নাই। স্ত্রীলোকও নাকি সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।' এঁদের কথা শুনে বুঝলাম একটি এন্টি-সোভিয়েট প্রপোগাণ্ডা আরব দেশে বেশ ভাল করেই চলেছে। তবে এদেশে যেরূপ ভাবে প্রপোগাণ্ডা করা হচ্ছে তা সুবিধাজনক নয়। এখনও আরব দেশে একজন লোক চারখানা পর্যন্ত বিয়ে করে। যে দেশে একজন চারটা বিয়ে আইন মতেই করতে পারে, সে দেশে স্ত্রীলোককে সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করে প্রপোগাণ্ডা করলে বেশি দোষ হয় না।

রাত চারটার পর শুতে গিয়ে দেখি একটি লোক আমার জন্য নির্ধারিত চারপাই-এর উপর শুয়ে আছে। ষ্টেশন-মাষ্টার সে দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে লোকটিকে আস্তে জাগিয়ে তার পেছনে কয়েক-বারই পদাঘাত করলেন। লোকটি কিছুই না বলে অন্য আর একটা চারপাই-এ শুয়ে পড়ল। কয়েক ঘণ্টা শোবার পরই ঘুম থেকে উঠলাম। প্রাতে ষ্টেশন-মাষ্টার ছিলেন না। তিনি অন্য কাজে বেড়িয়ে যাবার সময় আমার খাবারের এবং ব্যাবিলন যাবার জন্য একটা টাংগা ভাড়া করে দেবার জন্য বলে গিয়েছিলেন। ব্যাবিলনে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সহকারী ষ্টেশন-মাষ্টারের সংগে সাক্ষাৎ করলাম। লোকটিকে দেখেই মনে হল, এই ত সেই লোক, কাল রাত্রে লোকটা বেশ পদাঘাত খেয়েছিল। তাকে প্রকাশ্যে কিছু না বলে শুধু টাংগার কথাই বললাম। তিনি টাংগা ডাকিয়ে আমাকে ব্যাবিলনের দিকে বিদায় করে দিলেন।

ব্যাবিলন দেখে যখন ফেরলাম তখন ব্যাবিলন সম্বন্ধে তিনি নানা কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। কথাপ্রসংগে গতরাত্রের কথা জিজ্ঞাসা করার সময় একটু চালাকী করে কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম। সহকারী ষ্টেশন-মাষ্টার হলেন ইহুদী। কথাটা বলামাত্রই তিনি বললেন, "ষ্টেশন-মাষ্টার লোকটা বড়ই গোঁয়ার। নানা চিন্তা

করে তাকে আমি আঘাত করিনি। আমি যদি আঘাত করতাম, তবে মারামারি নিশ্চয়ই হত। হয়ত আমাদের মাঝে কেউ আহতও হতাম। উভয়কেই কোর্টে দৌড়াতে হত। এতে উভয়েরই ধনক্ষয় এবং পরিশ্রম হত। এত ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্যই নীরবে এই অপমান সহ্য করতে হয়েছিল।" আমি প্রকাশ্যে বল্‌লাম, "বেশ করেছেন"। আর মনে মনে বল্‌লাম "এজন্যই তুমি ইহুদী, এজন্যই তোমাদের স্থান পৃথিবীর কোথায় নাই, তোমরাই শ্রীচৈতন্য এবং বৌদ্ধের প্রকৃত চেলা।"

ব্যাবিলন। পৃথিবীকে সাতটি আশ্চর্য জিনিষ আছে, তার মাঝে একটি হ'ল ব্যাবিলন। বৃটিশ লেখকগণ ব্যাবিলন সম্বন্ধে কি লিখেছেন তার সবটা আমি কিছুই জানিনা। তবে তাঁরা লিখেছেন "ওভার হেংগিং গারডেন্ অব্ ব্যাবিলন্।" আমি আজ তাই দেখতে চলেছি। এক-ঘোড়ার গাড়িকে টাংগা বলে। টাংগা পানজাবী শব্দ। আমিও এই শব্দটিই ব্যবহার করলাম। কারণ আরব দেশে টাংগার প্রচলন ছিল না। পান্‌জাবীরাই টাংগা গাড়ী আরবে প্রচলন করেছে। টাংগার চালক হিন্দুস্থানী বলতে জানত। এতে আমার বেশ সুবিধা হয়েছিল। রেল-ষ্টেশন হতে ব্যাবিলন চার মাইল পথ হবে। পথের দুদিকে বালি। বালিগুলি পরীক্ষা করলাম। তাতে প্রচুর ফস্‌ফরাস এবং ফেলস্‌পার ছিল। সমুদ্র তীরের বালিতে শুধু ফস্‌ফরাস এবং ফেল্‌সপার প্রচুর থাকে। চার মাইল চলে গিয়ে টাংগা হতে নামলাম।

একটু হেঁটে গিয়ে একটি প্রস্তর মূর্তি দেখলাম। প্রস্তর মূর্তি গ্রেনেট পাথরের। গ্রেনেট পাথরখানা সলিড্। পাথরটির উপরে একটি লোক শায়িত এবং তার উপর একটা সিংহ মানুষটাকে যেন খেতে চাচ্ছে। মানুষটির শরীরের গঠন এপ্-মানুষের মত। হাত পা বেঁটে, বুক প্রশস্ত, কপাল চওড়া, কান বড় বড়। চুলগুলি লম্বা তবে যারা কখনও চুল কাটেনা এবং চুলের যত্ন নেয় না তাদের

চুল যেমন খর্ব থাকে, এপ্ ম্যানটির চুলও সেরূপেরই। দাঁত একটু লম্বা তবে পশুর মত নয়। গাল লম্বা ও ভাংগা। চোখ ছোট, ভ্রুর চুল অতি কম। শরীরের গঠন এবং মুখের দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় লোকটি ক্লান্ত।

সিংহের দিকে তাকালেও মনে হয়, এটা এযুগের সিংহ নয়। সিংহের ঘাড় হতে লেজ পর্যন্ত শরীরের অনুপাতে কম লম্বা, কেশরও খর্ব। পায়ের থাবার নখ শক্ত এবং ছোট। মুখের দাঁত ছোট এবং ধারাল। চোখ অতি উজ্জ্বল এবং ছোট। মুখের হাঁ ছোট এবং অতি নিশ্চয়। কাছেই এই মূর্তির ছবি বিক্রয় হয়। একখানা কিনে দেখলাম ফটোতে মূর্তির সবটা প্রকাশ পায়নি।

মূর্তিটার কাছেই একটা প্রকাণ্ড গহ্বর। গহ্বরে চুইয়ে জল আসছিল। যাঁরা পুরাতন স্থান রক্ষা করেন তাঁরা পাম্পের সাহায্যে জল বাইরে ফেলার বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। গহ্বরটার নীচে নামা যায়, আমি তাতে না নেমে উপরের রক্ষিত একখানা ইট পরীক্ষা করলাম। ইটখানা ধূসর রংগের। একটু ভেংগে দেখলাম ইটের ভেতরের রংও ধূসর বর্ণই। এটা আরব যুগের ইট নয়। আরব যুগের ইট ছোট এবং পাতলা এবং তাতে কর্মসুনিপুণতা দেখতে পাওয়া যায়। ব্যাবিলনের ইটে তার অভাব ছিল। মাটি দেখলে বুঝা যায় স্থানটি একদিন সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল। দুইশত সত্তর মাইল ব্যাপী স্থান নদীর কাদায় এবং সমুদ্রের ঢেউ দ্বারা আনীত বালিতে মিশে চড়া পড়তে অনেক সহস্র বৎসরের দরকার হয়। এতেই প্রমাণিত হয় ব্যাবিলনে অনেক সহস্র বৎসরের পুরাতন সভ্যতার আবাস-ভূমি ছিল।

আমার মনে হয় আমাদের দেশের পুরাতন ইংলিশ শিক্ষিত সমাজ ব্যাবিলন সম্বন্ধে পূর্বে কিছুই জানতেন না। ইংলিশ সাহিত্যে তাঁরা "ওভার হেংগিং গারডেন" বলে যখন কিছু পাঠ করেছিলেন তখন তার অনুবাদ করেছিলেন "শূন্যে-উদ্যান"। যাকে সন্ধি করে

ভূগোলে লেখা হয়েছে "শূন্যোদ্যান"। এরূপ ভাবে অনুবাদ করাটা তাঁদের মোটেই দোষ হয় নি, কারণ তখনকার দিনের বইগুলি এরূপ আজগুবি কথায়ই পূর্ণ ছিল।

তাদের কথা ছেড়ে দিয়ে আসল কথা বলা চাই। খাড়ি জমিতে সিঁড়ির মত করে বাগিচা করা হয়েছিল। সিঁড়ি যেমন ধীরে উঁচুর দিকে তির্যকভাবে হেলে গিয়ে মেজেতে মেশে, এটা কিন্তু সেরূপ ছিল না। এই সিঁড়িগুলি তির্যকভাবে সাগরের দিকে ঝুঁকে রয়েছিল। সেইজন্যই বলা হয়েছে—"ওভার হেংগিং গারডেন।"

ব্যাবিলন এত পুরাতন স্থান যার অতীতের কথা এখনও প্রত্ন-তত্ত্ববিদরা ঠিক করতে সক্ষম হন নি। অতি পুরাতন যুগে ব্যাবিলন দু'চার বিঘা জমি নিয়ে গড়া হয়েছিল। সেরূপ বাগিচা পৃথিবীতে বোধ হয় তখনকার দিনে একটিই ছিল। সেজন্যই এই বাগিচার এত নাম এবং পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্যের মাঝে তারও নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে বিস্ময়ের অনেক আছে, তবে সে বিস্ময় সাধারণ লোকের কাছে ছিল না এবং এখনও নাই। ইতিহাস নিয়ে যাঁরা ঘাটাঘাটি করেন তাঁদের কাছে স্থানটি সপ্তাশ্চর্যের এক আশ্চর্য এবং অন্যের কাছে তা কেরানীবাবু কথিত "অশ্বডিম্ব ছাড়া" আর কিছুই নয়।

জানি না ঘোড়ার ডিম দেখলাম না আর কিছু দেখলাম। তবে ব্যাবিলন আমার দৃষ্টিশক্তির তেজ বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমার মাঝে যে সংকীর্ণতা ছিল তার আর এক পরত ব্যাবিলন এক ঝাপটে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আরব সাগরে ফেলে দিয়েছিল। আমি এর পর থেকে পৃথিবীটাকে অন্য ভাবে দেখতে আরম্ভ করি। সেই ঝাপটার কথা এখনও মনে আছে, এখনও মনে হয় নর আর সিংহের লড়াই। মানুষ পরাজিত আর পশু বিজিত। আদিম যুগে মানুষ পশুকে ভয় করে চলত; আর এ যুগে মানুষ পশুকে ভয় করে না, পশুকে পশুর মতই হত্যা করে। মানুষ এ যুগে পশুজয়ী। আজ

যদি ব্যাবিলন সিংহের উপর একটা মানুষকে চড়িয়ে তার হাতে একটা চাবুক দিয়ে দেওয়া হয় তবে অন্যায় হবে না। একেই বলে মানুষের উন্নতির দিকে পরিবর্তনের সাক্ষ্য।

আজ আমরা যেমন করে ব্যাবিলন সম্বন্ধে ভাবি, দশ বৎসর পূর্বে রবট, উড়ন্ত বোমা, ইলেকট্রন এসবের কথা কেউ ভাবত না। মানুষ নিশ্চয়ই উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ব্যাবিলন দেখে তা অনুভব করেছি বলে আমি গর্ব অনুভব করি।

সেদিনই বিকাল বেলা গাড়ি পেলাম এবং ফের তাতে চেপে বস্‌রার দিকে রওয়ানা হলাম। গাড়িতে নানা রকমের লোক যাত্রী ছিলেন। আমি কাউকে ঘাটালাম না। কয়েক ঘণ্টা পরই আর একজন ভারতীয় যাত্রী গাড়ীতে উঠলেন। ভারতীয় যাত্রী মহাশয়ের মাথায় ফেজ ছিল। রং তাঁর কুচ্‌কুচে কালো। রেংগুন থেকে এসেছেন। আমার প্রতি তাঁর কি এক ধারণা হল বলতে পারি না। কতক্ষণ পর কাছে এসে বললেন, "আপনাকে রেংগুনে কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে, তাই নয় কি?" নিশ্চয়ই আমাকে সেখানে দেখেছেন, ভারতের জীবন-প্রদীপ ব্রহ্ম প্রদেশ আমি ভ্রমণ করেছি।

লোকটি জারবেদী। জারবেদীরা ভয়ানক এনটি-ইণ্ডিয়ান এবং ফেনাটিক। ব্রহ্মপ্রদেশকে ভারতের আয়ুরেখা বলায় লোকটির ভয়ানক রাগ হয় এবং তিনি আমাকে বার বার বলতে থাকেন—"ব্রহ্মদেশবাসীর নিজের ভাগ্য নির্ণয় করিবার অধিকার আছে, আমরা ভারতের সংগে থাকতে চাই না।"

কথা অনেকই হয়েছিল, এখানে ব্রহ্ম প্রদেশের কথা টেনে আনতে চাই না, তবে একটা বলবার অধিকার আমার আছে, যারা সোভিয়েট রুশিয়ার অনুকরণ করে সেল্‌ফ ডিটারমিনেশনের কথা বলে, উজ্‌বেগীস্তানের উল্লেখ করে, তারা জানে না উজ্‌বেগদের মানুষ করতে ষ্ট্যালিনের কত বেগ পেতে হয়েছিল। আগে নিজে মানুষ হয়ে অপরকে মানুষ কর, তারপর সেল্‌ফ ডিটারমিনেশনের কথা বলা

উচিত ; এর পূর্বে নয়। সেল্‌ফ ডিটারমিনেশনের অর্থ নানা রকমেই হয়। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সেল্‌ফ ডিটারমিনেশনের নাম করে অনেক দেশেই চুটিয়ে রাজত্ব করছে।

গাড়ি সকাল বেলা মারগিলে এসে থামল। ষ্টেশন থেকে নেমে রেলওয়ে গার্ডদের মেসে গিয়ে উঠলাম। একজন গার্ড তাদের মেসে যাওয়ার জন্য আমাকে বলেছিলেন। আরব এবং ইণ্ডিয়ান উভয় জাতের লোকই একই মেসে থাকে। মেসের পাচক একজন ইহুদী। লোকটির পাক আমি খাইনি, তবে তার পোষাক দেখে হাসি পেত। লাল ফেজ মাথায় দিয়ে পা পর্যন্ত লম্বা কোটের উপর কোমরে লম্বা কাপড় বেল্টের মত বেঁধে যখন সে বাজারে বেড়িয়ে যেত, তখন অনেকক্ষণ তার দিকে আমি তাকিয়ে দেখতাম।

এদিকের আরব মাথায় ফেজ দেয় না। একদিন তুরুকরা ফেজ মাথায় দিত বলে আজও যারা তুরুক-ভয়ে ভীত তারা ফেজ ব্যবহার করে। আরবদেশের আরব যেমন ফেজ ব্যবহার করে না, তেমনি তারা প্যান-ইসলামেও যোগ দেয় না। প্যান-ইসলামে তুরুক ভয় যেন এখনও জড়িত আছে। আরব অনেক দিন ছিল তুরুকের অধীন, সেইজন্যই তারা এখন ফেজকে বিদেশী শিরস্ত্রাণ বলেই গণ্য করে।

প্যান-ইসলাম নিয়ে কখনও আমি কথা বলিনি, কিন্তু অনেক আরব নিজে এসে আমাকে প্যান-ইস্‌লামের প্রচারক ভেবে এ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছেন। আমি তাদের কথা আগ্রহ করেই শুনেছি, কিন্তু যখন উত্তর দেবার পালা এসেছে তখনই আমি মামুলী পর্যটক বলে পরিচয় দিয়ে এসব বাজে কথা হতে রক্ষা পেয়েছি।

মারগিল্‌ হতে বস্‌রা পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। বাস প্রত্যেক পাঁচ মিনিট অন্তর যাওয়া-আসা করে। পরের দিনই বস্‌রাতে রওয়ানা হলাম। পিচ দেওয়া পথের দুদিকে একরকম লম্বা ঘাস হয়েছে। সে ঘাসগুলি অতি সূক্ষ্ম এবং দুটা দিকই একটু ধারাল।

গরম দেশে বালুকণার উপর এরূপ ঘাস প্রায়ই দেখা যায়, কিন্তু আরব কবি এই ঘাসের সৌন্দর্য লিখে, তার গান গেয়ে রবীন্দ্র-রচনাবলীকে বহু পেছনে রেখে অনেক এগিয়ে গেছেন।

বস্‌রা সমুদ্রতীরে অবস্থিত নয়। সমুদ্র হতে কয়েকটি উল্টা জলস্রোত বস্‌রার তিন দিক ঘিরে ফেলেছে। অন্য কথায় বলা যেতে পারে, সমুদ্রের মাঝে ছোট ছোট ভূমিখণ্ডের উপর বস্‌রা শহর গড়ে উঠেছে। বস্‌রাতে কয়েকটি বাগিচা আছে। তাতে গোলাব হয়। সে গোলাব অন্য দেশের গোলাব হতে একটুও উৎকৃষ্ট নয়, তবুও কবি গাইছেন বস্‌রার গোলাবের কথা। সেই কথার ঢেউ আরব সাগর পার হয়ে বাংলা দেশ পর্যন্ত এসেছে। বাংগালী ভাবে বস্‌রা গোলাবময়। প্রকৃতপক্ষে কলকাতার যে কোন ওয়ার্ডের উৎপন্ন গোলাব একত্রিত করলে বস্‌রার গোলাবের পরিমাণ থেকে অনেক বেশি হবে। আমি সাইকেল নিয়ে বস্‌রার গোলাবোদ্যান দেখতে বের হয়ে দু'শ ফুটন্ত গোলাবও দেখতে পাই নি। বস্‌রা আরবের কাছে প্রিয়, অতএব বস্‌রা গোলাবে ভর্তি আরবের কাছেই।

বস্‌রার আশে পাশে অনেক ঐতিহাসিক স্থান আছে, তবে সেই স্থানগুলি আমাকে টানতে পারে নি। আমি মারগিলের বাবুরোডে অনেক দিন কাটিয়েছি এবং বাবুরোডের কথা ভেবে দু'এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলেছি। শুনতে পাওয়া যায় বস্‌রায় বাবুরোড বাবুদের দ্বারাই তৈরী হয়েছিল। একজন ভারতীয় জমাদার পথ প্রস্তুতের সুপারভাইজার ছিল। আজ বাবুরোডের দুদিকে সুন্দর ফুলের বাগিচা হয়েছে। তাতে গোলাব ফুটে। গোলাবের গন্ধে সকাল বেলা বাবুরোড আমোদিত হয়। বাবুরোডে বাবুদের দ্বারা রোপিত গোলাবের গন্ধ অনুভব করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বাবুরোডের কথা অনেকেই ভুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই বাবুরোড আবার হয়ত লোকারণ্য হয়েছে বর্তমান মহাযুদ্ধের জন্য।

ভারতের সংগে ইরাকের রেলের মিলন নিশ্চয়ই হবে। পুঁজিবাদি জাহাজ কোম্পানীর কথা ভবিষ্যতে কেউ শুনবে না। মারগিলের বৈচিত্র্যময় বিশিষ্টতা একদম লোপ পাবে। স্থলপথে ব্যবসা বাণিজ্য যদি করা যেতে পারে, তবে জলপথে কে যেতে চায়? বৃটিশ বণিকদের সেদিকে স্বার্থহানি হবে বলেই তারা এখনও ভারতের সংগে আরব দেশের রেলপথের সংযোগ করছে না।

মারগিল সম্বন্ধে এখনও পত্র লেখায় সময় হয়নি, কারণ মারগিল অথবা বস্‌রা এলাকাতে লোকের বসতি অতি কম। সমুদ্র-পথে ব্যবসা-বাণিজ্য যা হয় তা শুধু ভারতের সংগেই। বড় বড় নৌকার সাহায্যেও ব্যবসা হয়, তা শুধু আরবের উপকূলভাগেই হয়। অতএব এর মধ্যে রোমাঞ্চ বলে কিছু বের করবার নেই। তবে আরব্য রজনী রচনা করার মত অনেক কিছু সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়।

মারগিলে কয়েক জন বাংগালী কেরানীর সংগে দেখা হয়ে যাবার পর এক দিনের মধ্যেই তৈরী হয়ে পুনরায় বাগদাদের দিকে রওয়ানা হয়েছিলাম। দেখার উপযুক্ত যদি কিছু থাকে তবে বস্‌রাতেই ছিল। মারগিলে কিছু দেখবার অথবা জানবার ছিল না।

সিরিয়া

আমি পথের মানুষ। সেজন্য পথের কথাই বলতে ভালবাসি। সাহিত্য আমার কথার মাঝে নেই, নিছক পথের কথা ছন্দহীনভাবে বলে যাওয়াই হল আমার অভ্যাস।

যাঁরা আরব সভ্যতা সম্বন্ধে কিছুটা জানেন, তাঁরা দামাস্কাস নগরের সম্বন্ধে অল্পবিস্তর সংবাদ নিশ্চয়ই রাখেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, পৃথিবী পরিবর্তনশীল। কেউ কোন দিন ভাবেনি, মরুভূমির উপর দিয়ে মোটর বাস হন্ হন্ করে চলবে। কেউ ভাবেনি অখণ্ড আরব দেশ নানা ভাগে বিভক্ত হবে, কিন্তু আজ আরবের মরুভূমিতে বিজলী বাতির আলো প্রজ্বলিত হয়েছে, মরুভূমির উপর দিয়ে মোটর চলেছে, আরব জাত পরিবর্তনের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ইউরোপীয় পর্যটকগণ সে সংবাদ বলতে ভালবাসে না, কারণ তারা জানে, আরব জাতকে প্রাধান্য দিলে একদিন তাদেরই অসুবিধা ঘটবে। আমি সে শ্রেণীর লোক নই। আমার দেশ যেমন পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ, আরব জাতের অবস্থাও অনেকটা সেরূপই হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই অবস্থায় আরবদের সকল কথা খুলে বলাই ভাল।

আরবদের মরুভূমিতে পরাধীনতা বলে কিছু ছিল না। আরব বেদুইন কখনও কারো কাছে মাথা নত করে নাই। আরব বেদুইন মাথা নত করে শুধু আল্লার কাছে, আর মাথা নত করে যখন তার মাথা তলোয়ারের আঘাতে শরীর হতে চ্যুত হয়। আরবের ভিখারী পর্যন্ত উন্নত শিরে "জাকাত" আদায় করে, ভিক্ষা তারা চায় না।

বাগদাদ হতে দামাস্কাস চার শত একষট্টি মাইল দূরে অবস্থিত। এর মাঝে চার শত মাইলব্যাপী এক মরুভূমি। স্থানে স্থানে মরূদ্যান

আছে। কিন্তু বাগদাদ হতে সাড়ে তিনশত মাইল না গেলে একটিও মরুদ্যান পাওয়া যায় না। শিক্ষিত ভারতবাসীরা আমাকে সেরূপ মরুভূমির মধ্য দিয়েই সাইকেল ঠেলে চলে যেতে বলেছিলেন। কয়েক মাইল গিয়েও ছিলাম, কিন্তু সুবুদ্ধির উদয় হওয়ায় ফিরে এসেছিলাম, নতুবা আজ আর আমাকে ভ্রমণ কথা লিখতে হতো না; মরুভূমির মাঝে বালিতে চাপা পড়ে থাকতে হতো। হয়তো এদেশের সংবাদপত্র বলত, লোকটা পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছিল, কোথায় গিয়ে ঘরসংসার করছে।

পূর্বেই বলেছি, আরবদেশকে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীরা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে মনের সাধ মিটিয়ে শোষণের ব্যবস্থা করেছে। ইরাক হতে সিরিয়া যেতে হলে ফরাসী সরকারের অনুমতিপত্র নিতে হয়। এই অনুমতিপত্র ব্যবহারের নিয়ম উঠিয়ে দেবার জন্য এবং অন্যান্য নানা কারণে একত্রীভূত হবার পর সিরিয়ার অধিবাসীরা একবার বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু বিদ্রোহ বিফল হয়। ফরাসীদের ঈপ্সিত অনুমতিপত্রই বজায় থেকে যায়। আমাকেও সেই অনুমতি-পত্র বা (ভিসা) নিতে হয়েছিল।

ভিসা পাওয়া সহজ কাজ নয়। অনেক সময় ঠিকমত কথার জবাব না দিতে পারলে অনুমতিপত্র পাওয়াও যায় না। আমাকে ভিসা পেতে রীতিমত বেগ পেতে হয়েছিল।

বাগদাদ হতে অনেকগুলি বাস দামাস্কাসে যায়। তারই একটি বাসে দুই পাউণ্ড (ছাব্বিশ টাকা দশ আনা) দিয়ে একখানা টিকিট কিনে একদিন সুপ্রভাতে হারুণ্-অর্-রশিদের বাগদাদ ছেড়ে ঐতিহাসিক নগর দামাস্কাসের দিকে রওনা হলাম।

বাগদাদ হতে আমাদের রওনা হবার পূর্বে একজন পুলিশ অফিসার এসে যাত্রীদের সংখ্যা, আসবাবের ওজন বেশ ভাল করে দেখে নিয়ে নিজে প্রথমেই মোটর ড্রাইভারকে পল্টনী কায়দায় অভিবাদন করলেন। ড্রাইভার তার ডান হাতখানা

মোটরে হ্যাণ্ডেলের উপর রাখল। অফিসার জাতে আসীরিয়ান, তবে তিনি আসীরিয়ানদের মত গোঁপ-দাড়ি রাখেন না, একদম ক্লিনশেভ।

সুন্দর পথ ধরে আমাদের বাস ফেলুজা পর্যন্ত এল। আরবগণ ভারতবাসীদের মোটেই পছন্দ করে না, একথা পূর্বেই বলেছি। হিন্দীদের প্রতি কি কারণে আরবদের ঘৃণার সঞ্চার হয়েছে, তার কারণ কিছুটা বলেছি। আমার প্রতি কিন্তু তারা অসৎ ব্যবহার মোটেই করেনি। আমি তাদের দেশে যাবার পর কখনও এমন কথা বলিনি, যাতে করে তাদের জাতীয় ভাবের কোনরূপ অনিষ্ট হতে পারে।

এখন আমি ফেলুজার কথা কিছুটা বলব, কারণ ফেলুজাতে পূর্বে আমি সাইকেলে করে আর একবার এসেছিলাম। ফেলুজা একটি ছোট গ্রাম। নদী তার কাছ দিয়ে বয়ে চলেছে। এখানে যে সকল লোক বাস করে, তারা প্রায়ই ধর্মে সুন্নি শ্রেণীর লোক, এরা সবাই শ্বেতকায় আরব। নিগ্রো, অর্ধনিগ্রো, হিন্দী, ইহুদী এসব জাতের সংগে তাদের বিয়ে হয় না। এদের মাঝে প্রচলিত নিয়ম হলো, কালো লোকের মেয়েলোক দাসীরূপে তাদের পরিবারে প্রবেশ করতে পারে, তাদের মেয়ে কোনমতেই কালো লোকের স্ত্রী হতে পারে না। সেজন্যই এখানে পূর্বে যখন আমি এসেছিলাম, তখন ইহুদী, কালো আরব এরাই আমাকে আদর-যত্ন করেছিল বেশী। সাদা আরব কখন কখন তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে জলযোগ করিয়েই বিদায় করে দিত। এসব স্থানে কখনও কেউ আমার ধর্ম কি তা জিজ্ঞাসা করেনি। ধর্ম নিয়ে একদিন আরবদেশে বেশ আলোচনা চলত, এখন আরবজাত জাতীয়ভাবাপন্ন হয়েছে, সেজন্যই বোধ হয় তাদের চিন্তাধারাও বদলে গেছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত বলছি, আরব দেশে এখনও রংএর বৈষম্য আছে দেখে আমার মন অনবরত ম্রিয়মাণ হয়ে থাকত। অনেক সময় সাদা আরবরা তাদের হাতের আস্তিন

খুলে দেখাত আর বলত, "দেখত আমার শরীরের রং কত সাদা আর তোমার রংটা কত কালো।"

ফেলুজার আরবগণ সিয়া, সুন্নি, খৃষ্টান, অগ্নি-উপাসক, জল-উপাসক, পাথর-উপাসক যাই হোক, বেদেশীকে তারা মোটেই পছন্দ করে না। পানজাবের মুসলমান নাপিতের দ্বারা খেউরী হয় না, বুন্দেলখণ্ডের ধোবার দ্বারা কাপড় কাচায় না; বেহারের ডাক্তারের কাছ হতে ঔষধ নেয় না। সেজন্য অনেক ফাল্‌তু হিন্দী ফেলুজা হতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে।

ফেলুজাতে যাবার পর আমি এক মাদ্রাসার শিক্ষকের বাড়ীতে গিয়ে উঠেছিলাম। তিনি আরবী ভাষাতে মৌলবী এবং ফ্রেন্‌চ ম্যাট্রিক। একটু আধটু ইংলিশ ভাষাও বলতে পারেন। তাঁর উদারতায় গ্রামের লোক মুগ্ধ। তিনি আমার লেক্‌চার গ্রামবাসী-দিগকে অন্য একজন দোভাষীর মারফতে অনুবাদ করে শুনিয়ে-ছিলেন। দোভাষী বেশ ভাল হিন্দুস্থানী জান্‌তেন, তিনি সে জন্যই আমার মনের কথা ঠিকভাবেই বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। দোভাষী কখনও ভারতে আসেন নি। অনেক দিন তিনি মক্কায় ছিলেন এবং ভারতীয় হাজীদের নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। এতেই এত সুন্দর করে হিন্দুস্থানী বলতে সক্ষম হয়েছেন দেখে আমার তাক্ লেগে গিয়েছিল। আরব জাতির মস্তিষ্ক সাধারণতঃই পরিষ্কার, তার উপর ভদ্রলোক নানাদেশ বেড়িয়েছেন। একটা বৈদেশিক ভাষা আয়ত্ত করা তাঁর পক্ষে যদিও সহজ ছিল, কিন্তু এমন সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে পারবেন, তা আমার ধারণাও হয়নি।

লেকচার দেবার পর মাদ্রাসার ছাত্রেরা ভারতের কথা একটিও জিজ্ঞাসা করল না। চীন দেশে কত মুসলমান আছে তার কথাও উঠাল না। তারা জিজ্ঞাসা করল জাপানীরা নিজের জাতের উন্নতির জন্য পেট কেটে মরে, সেই দেশ-প্রেমটা কি করে তাদের মাঝে জাগল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, চীন দেশে ঢুকে কোন্ শক্তির

সাহায্যে চার হাজার মাইল পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। তাদের প্রশ্নের উত্তর পরদিন আমাকে দিতে হয়েছিল। ভারতে ফিরে আসার পর আমাদের দেশের ছেলেরা জিজ্ঞাসা করেছিল, স্বামী বিবেকানন্দ কি আমেরিকার সবাইকে হিন্দু করেছেন? চীন দেশে কত মুসলমান আছে? এখানেই আমাদের মাঝে এবং আরবদের মাঝে পার্থক্য।

পরদিন লেক্‌চার দিয়েছিলাম। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। লক্ষ্য করে দেখলাম, আরবরা পর্যটন-কথা শুনতে বড়ই ভালবাসে এবং যত বল ততই যেন আরও শুন্‌তে চায়। তারা পর্যটন-কথা নীরবে শোনে, কখনও লেক্‌চারের সময় কেউ কাশে না, যদি কেউ কাশতে চায় অথবা থু থু ফেলতে চায়, তবে উঠে গিয়ে বাইরেই এসব করে। পর্যটন-কথা আরব স্কুলে এবং আরব সমাজে বলেও আনন্দ হয়।

ফেলুজায় একদিন কষ্ট করে সাইকেলে এসেছিলাম, সেই ফেলুজা গ্রামকে আজ কয়েক মিনিটের মাঝেই পেছনে রেখে তারই কথা চিন্তা করতে করতে এগিয়ে চলতে হল। এখান হতেই শুরু হল মরুভূমি।

মোটর-বাস অনবরত চল্‌ছে। ড্রাইভার যখনই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছে, তখনই অন্য ড্রাইভার তার স্থানে বসে নতুন তেজে গাড়ীকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমার পাশেই দুজন ত্রিপোলীর আরব বসেছিল। তাদের মাথায় লাল ফেজ দেখে মনে করেছিলাম, এরা নিশ্চয়ই খৃস্টান নয়ত ইহুদী। কথাপ্রসংগে তারা বলল, সুয়েজ-খালের পশ্চিম দিকের আরবগণ লাল ফেজ ব্যবহার করে। তারাও সুন্নি শ্রেণীর লোক। এদিকের অর্থাৎ আরবের সুন্নিরা ভুলেও ফেজ মাথায় দেয় না। এই পার্থক্যের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তারা বলল, এদিকের সুন্নি আরবগণ প্রায় সকলেই হজে গিয়েছেন বলে হাজির পোষাকই সর্বসাধারণের পোষাক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ত্রিপোলী হতে

অতি অল্প লোকই হজ্জ করতে আসে, সেজন্যই ত্রিপোলীর আরবগণ ফেজ ব্যবহার করে থাকেন। ইতালীয়ানরা আরবদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে, তা জানতে চাইলে তারা কোন উত্তর দেয়নি, কারণ পাশেই কয়েকজন ইতালীয়ান বসেছিল। আমরা যেমন ইংলিশ-ম্যানের সামনেই তাদের জাতের শ্রাদ্ধ করতে পারি, ইতালিয়ানরা সেরূপ করতে দেয় না এমন কি, সিনোর মুসোলিনীর বিরুদ্ধে কোন কথা শুনলে তৎক্ষণাৎ তারা প্রতিবাদ করে। ত্রিপোলীতে কড়া শাসন ও শোষণের নিদর্শন গাড়ীতে বসেই অনুভব করতে পেরেছিলাম।

যারা যত অত্যাচারিত হয়, তারাই তত সবল হয়ে ওঠে। এই দুটি ত্রিপোলীর আরব ভয়ানক ন্যাশনালিষ্ট। তারা সময় মত আমার সংগে কথা বলেছিল। আমাদের দেশের তথ্য অনেক সংগ্রহ করেছিল। আমি অমুসলমান জানা সত্বেও তারা উত্তর আফ্রিকার পরাধীনতার সংগে ভারতের তুলনা করেছিল। যতক্ষণ তাদের সংগে কথা হয়েছিল, ততক্ষণই তারা ইতালীয়ানদের বিরুদ্ধে অনবরত বকে যাচ্ছিল। একবারও প্যান-ইসলাম অথবা অন্য কোন মতবাদের কথা বলেনি। তাদের মাঝে একটি মাত্র "প্যান্"-এর ইংগিত ছিল, সেটি হল অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত; স্বাধীন এবং পরাধীন। স্বাধীনতার স্বাদ যারা পায়, তারা ভুলেও ছোট ভাব মনে পোষণ করে না। যারা আজীবন গোলাম হয়ে থাকতে চায়, তারাই "প্যান্-হিন্দুইজ্ম্" বৃহত্তর ভারত, বৃহত্তর বংগ, প্যান্ ইসলাম এসব বুলি আওড়ায়।

কয়েক জন ইরানী যাত্রীও আমাদের সংগে ছিল। একজন ইরানী কন্ডাক্টরের কাছে না জিজ্ঞাসা করেই বিপদ্কালের জন্য রক্ষিত জলের পাইপ খুলে ইচ্ছামত জল খেতে লাগল। প্রকৃতপক্ষে কন্ডাক্টরের কাজই হল জল রক্ষা করা এবং যাকে যতটুকু কম জল দিয়ে পারা যায়, তাই দেখা। কন্ডাক্টর ইরানী ভদ্রলোককে জলের পাইপ বন্ধ করতে বলায় সে তার কথা শোনেনি; বরং তাকে

ইরানী ভাষায় দু'একটা কুকথাই বলেছিল। ইরানী ভদ্রলোক কোন মতেই আরবী বলছিল না, আরবটিও ইরানী কথা বলতে ঘৃণা প্রকাশ করেছিল। তারপর শুরু হল ফ্রেন্চ্ ভাষায় কথা। এদের কথার সারমর্ম যা বুঝেছিলাম, তাতে মনে হল, ইরাকী-আরবদের ইরানীরা পরাধীন বলেই গণ্য করে এবং শ্লেষ করেই কথা বলছিল।

এদের ঝগড়া যখন চরমে উঠল, তখন অন্যান্য যাত্রী তাদের থামিয়ে দিল। ফ্রেন্চ, ডাচ, বৃটিশ সবাই এ ঝগড়ায় নীরব ছিল। তারা মনে মনে কি ভাবছিল, তারাই জানে, তবে লক্ষ্য করছিলাম, এরা প্রত্যেকেই মুখ ফিরিয়ে ছিল। আমি ছিলাম দর্শ এবং প্রত্যেকের প্রতি আমার লক্ষ্য ছিল।

সন্ধ্যার পূর্বে রুতবাতে (Rutba) এলাম। সেখানে গাড়ী থামল। সকল যাত্রীই নেমে গিয়ে সেখানকার কুয়ায় হাত-মুখ ধুতে লাগল। আমরা সবাই একই ভাবে হাত-মুখ ধুতে লাগলাম; কিন্তু কয়েক জন ইউরোপীয় অর্থাৎ ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান এরা কেউ হাত-মুখ ধুলে না। এমন কি, ইতালীয়ানরা পর্যন্ত আমাদের মত হাত-মুখ ধুলে, তাতে মনে হল, এদের সংগে আমাদের যেন কোন পার্থক্য নাই। একজন ইংলিশকে জিজ্ঞাসা করলাম, হাত-মুখ ধুলে না যে? লোকটি বললে, এভাবে হাত-মুখ ধোয়া তাদের পোষায় না। অন্তত একটা বেসিনে জল না রেখে তারা হাত-মুখ ধুতে পারে না।

মুসলমানরা যখন দক্ষিণদিকে মুখ করে নামাজ পড়ছিলেন, ইউরোপীয়রা যখন ফ্লাস্ক হতে চা অথবা কাফি খাচ্ছিলেন, আমি তখন লোকের আচার-ব্যবহারের কথা ভাবছিলাম। এত গরমে, কত ধূলা নাকের মধ্যে প্রবেশ করেছে, আর এরা হাত-মুখ ধুলে না একটা পাত্রের অভাবে। এখানেই পার্থক্য—আচার-ব্যবহারের। আমি চিন্তায় এতই তন্ময় হয়ে গিয়াছিলাম যে, জলের কূয়াটা কত গভীর তা-ও দেখতে যাইনি। আমাকে যেন ভাবের ঘোরে পেয়ে বসেছিল।

গাড়ী চলবার আধ ঘণ্টা পূর্বে হর্ন দেওয়ায় আমার চমক ভাংল আমি চটপট কয়েকখানা রুটি খেয়ে নিলাম। তখন আর কূপ কত গভীর দেখার সময় ছিল না। আমি আর চিন্তা না করে সিটে গিয়ে বসতে বাধ্য হলাম। এবার গাড়ী চলল দ্বিগুণ তেজে।

মরুভূমির রাত আমরা বসে বসেই কাটাতে লাগলাম। আমাদের চোখ ঘুমের ঘোরে বুজে আসছিল। কখনও বা তন্দ্রা এসে আমাদের সকল কথা ভুলিয়ে দিচ্ছিল। আরব্য রজনী আমাদের সুখ এবং দুঃখের মাঝ দিয়েই টেনে নিচ্ছিল। আরব্য রজনী সর্বদাই সুখের।

রাত্র যখন চারটা, তখন হঠাৎ বাসখানা লাফিয়ে উঠল। বুঝলাম, কোথা হতে বয়ে যাওয়া নদী আরব মরুতে লয় হওয়ার পূর্বে তার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটা দাগ রেখে গেছে, সেই স্মৃতির চিহ্ন ঝাঁকানি দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিল নদীর অস্তিত্ব। চোখ মেলে চেয়ে দেখলাম—বাঁ-দিকে প্রকাণ্ড একটা পাহাড়। পাহাড়টার নাম 'যাবল তিনেফ' (Jabol Tinf)।

এখানে আমাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। এখান হতেই ফ্রেঞ্চ অধিকৃত সিরিয়ার আরম্ভ। রাত প্রভাত হবার সংগে সংগেই ফ্রেঞ্চ কাষ্টম অফিসার আমাদের হাত নেড়ে এগিয়ে যেতে আদেশ দিলেন। আমরা এগিয়ে চল্‌লাম। বেলা দশটার সময় আমরা যখন কাষ্টম অফিসে আসলাম, তখন একজন ফ্রেঞ্চ অফিসার আমাদের লাগেজ পরীক্ষা করলেন। তিনি প্রত্যেকের সংগেই সদয় ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু বাসের উপর একটি ছোকরা অফিসার আমার সাইকেলটা আবিষ্কার করল। আমার সাইকেল কেন বৃটিশ ফেক্‌টরীতে তৈরী এবং কেনই বা ফরাসী ফেক্‌টরীতে তৈরী হয়নি, তা নিয়ে অনেকক্ষণ তর্জন-গর্জন করে আমার দিকে তাকিয়ে ফরাসী ভাষায় কি বলল। আমি হিন্দুস্থানীতে বললাম—"এইসা দিন নেহি রহেগা।" বাস্তবিকই আমি ফ্রেন্‌চ ভাষায় কথা বলতে মোটেই

পছন্দ করতাম না ; কারণ, ফ্রেন্‌চদের সাম্রাজ্য-রীতি বৃটিশ সাম্রাজ্য-রীতির অনেক নীচু স্তরের।

ছোকরা অফিসার যতই দাঁত কিড়মিড় করছিল, ততই আমি হিন্দুস্থানীতে তাকে ভদ্রভাষায় প্রবোধ দিচ্ছিলাম। এটাও ঠিক করে রেখেছিলাম, যদি লোকটা মুখের কাছে এসে কথা বলে, তবে তার ভাগ্যে আমার চপেটাঘাত অবধারিত। এখানে বৃটিশদের কাছ হতে অনেক শেখার আছে। তুমি হৈ-চৈ কর, চীৎকার কর, বৃটিশ কিছু বলবে না। তুমি মুখে মুখে বৃটিশকে, দেশ হতে বিদায় কর, সে কিছু বলবে না, কিন্তু যেই তার অনিষ্টকর কাজে লেগে যাবে, অমনি সে তোমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। আমিও সেই রীতি অনুসরণ করেই ফ্রেন্‌চ্ অফিসারের কিচির-মিচিরে কান দিচ্ছিলাম না।

স্বাধীন দেশে গেলে স্বাধীনতার সততা আপনিই আসে। সাহসের অভাব হয় না। প্রাণের মমতা থাকে না। মনে হয় যেন আমিও তাদের মতন মানুষ, এবং তাদেরই মত কর্ম-প্রেরণায় চালিত হচ্ছি।

ছোকরা অফিসার আমার কাছে এল না, কিন্তু বুঝলাম, ভবিষ্যতে সে আমার অনিষ্ট করবে। তার অনিষ্ট করবার শক্তি কতখানি, তা আমি জানতাম, সেজন্যই নিজের কি অনিষ্ট হবে তা মন হতে অপসরণ করে দিলাম। শেষটায় যখন দামাস্কাসে এসে পড়লাম, তখন দামাস্কাসের কথাই ভাবতে লাগলাম। পুরাতন সভ্যতার ভেতর থেকে নতুন জাতীয়তাবাদ-পূর্ণ সিরিয়ার আরবের স্বাধীনতা-স্পৃহার প্রগতির ঢেউ গুণতে প্রবৃত্ত হলাম।

গাড়ী হতে নামার পর বুঝলাম শরীরটা যেন গির্ গির্ করছে। ভাবছিলাম সময় পেলে নিজেই শরীরটাকে ম্যাসাজ করে নেব। তারপর সাইকেলটা লরী হতে নামিয়ে পিঠঝোলাটা কেরিয়ার-এ বেঁধে হোটেলের দিকে রওয়ানা হলাম। হোটেল কোন্ দিকে তা-ও আমার জানা ছিল না। তবে এটা জানতাম, নিকটেই ফ্রেন্‌চ

গোয়েন্দা দাঁড়িয়ে আছে। সে নিশ্চয়ই এসে আমাকে পথ দেখিয়ে দেবে। হলও তাই। একজন লোক এসে বিশুদ্ধ ইংলিশে আমার সংগে কথা শুরু করল। তাকে সস্তা হোটেল দেখিয়ে দিতে অনুরোধ করায়, সে সানন্দে শহরের ঠিক মাঝখানে একটি আরব হোটেলে এনে হাজির করল। লোকটি বেশ রসিক—ফ্রেন্চ কিনা! সে বলল, এখানে সবই পাওয়া যায়। কথাটার তাৎপর্য বুঝতে দেরী হল না। হোটেলের মালিক একজন আরব। আমাকে একটা রুম দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল।

পূর্বেই বলেছি বর্মা সমেত ভারতবর্ষ এবং আফগানিস্থান ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্রই হোটেলে রুম নেওয়ার অর্থ লেপ, তোষক, বালিস, মশারী, স্নানের ব্যবস্থার জন্য ভাবতে হয় না, ঘাড়ে করে বিছানা বয়ে নিয়ে যেতে হয় না। আরব দেশে হোটেল মানেই শয়নের স্থান, আহারের স্থান নয়। আরবরা সেদিক দিয়ে আমাদের দেশকে ডিংগিয়ে গেছে। আমরা তো এখনও সেই ফিউডাল অবস্থায়ই পড়ে আছি।

হোটেল-মালিক আমাকে পর্যটকরূপে গ্রহণ করে আনন্দিত হয়েছিলেন, কিন্তু যে লোকটি আমাকে তাঁর হোটেল দেখিয়েছিল সে লোকটি ছিল পুলিশ। সেজন্য তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন। ফ্রেন্চের অধিকৃত কলোনিগুলিতে পুলিশের অত্যাচার ভয়ানক। এমন কি, ফ্রান্সেও ফ্রেঞ্চ পুলিশ স্বজাতীয়কে স্নেহদৃষ্টিতে দেখে না। কিন্তু আরব জাত মাখনের টুকরা নয় যে রৌদ্র লাগামাত্রই গলে যাবে। আরব জাত অত্যাচার সহ্য করে না, দাঁতের বদলে দাঁত নেয়—আপন প্রাণ বিসর্জন দিয়েও। আবার আরবদের মধ্যেই যারা ধনী, তারা কিন্তু বিলাসী। বিলাসীরা অপমান সহ্য করে, শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে নারাজ। হোটেলের মালিক একজন ধনী আরব। এই জন্যই হোটেলের মালিক একটু দুঃখিত হয়েছিলেন।

স্নান করে, নিকটস্থ একটি রেস্তোরাঁয় কিছু খেয়ে সেদিনের মত বিশ্রাম করার জন্য দরজা বন্ধ করতে যাব, এমন সময় একজন পোষাকী পুলিশ এসে আমাকে বললে, আজ থেকে চার দিন পর আমাকে সিরিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। পুলিশ জাতে আরব। সে কথাটা বলেই ইংলিশে বলল—এর জন্য ঘাবরাতে হবে না, আর পনরদিন ইচ্ছা করলেই থাকতে পারবেন; এখানকার ইমিগ্রেসন অফিসার হলেন আরব, তাঁর কাছে গেলেই সকল ব্যবস্থা করে দেবেন। পুলিশকে বিদায় করে দিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম।

সারাটি বিকাল বেলা বেশ ভাল করে ঘুমিয়ে রাত্রের বেলা একটি কাফেতে গিয়ে বসলাম। বুঝলাম এখানে যাঁরা বসে আছেন তাঁদের মধ্যে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও আছেন। আমার পোষাক, আমার সাইকেল, আমার শরীরের রং প্রত্যেকেরই নজরে পড়েছিল। একজন আমার টেবিলে এসে পরিচয়ও জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর ধারণা ছিল, ভারতের প্রত্যেকটি নরনারী তাঁদেরই মত। কিন্তু তাঁর সে ধারণা আমার সংগে কথা বলতেই দূর হয়ে গেল। তিনি আমাকে আর একজন ভদ্রলোকের সংগেও পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেই ভদ্রলোক সরকারী কর্মচারী, ফ্রেন্চ্ এবং ইংলিশ বলতে পারতেন।

কথাপ্রসংগে তিনি আমার কাছ থেকে ভারতের সংবাদ সংগ্রহ করতে লাগলেন। আমিও ভারতের সংবাদ তাকে দিয়েছিলাম। তারপর, আমার প্রতি যে পরওয়ানা জারী করা হয়েছে, তার কথা বলায়, তিনি আমার পাসপোর্ট এবং সে পরওয়ানাটা ভাল করে দেখে বললেন, আপনি আগামী কাল সকালের দিকে ইমিগ্রেসন অফিসে গিয়ে আমার এই বন্ধুটির সংগে সাক্ষাৎ করলেই এই দুর্ভোগ থেকে উদ্ধার পাবেন। এখানে বসে যদি একজন জাতীয়তাবাদী হিন্দিকে সাহায্য করতে পারি, তবে জীবনে একটি সুকাজ করেছি বলে গর্ব অনুভব করব। ভদ্রলোকের কথায় আমি আনন্দিত হলাম। রাত দুটা পর্যন্ত তাঁদের সংগেই কাটিয়েছিলাম।

এঁরা হলেন সুন্নি মুসলমান। সিরিয়ার মেজরিটিই হল সুন্নি। যত রাজনৈতিক কারবার তাঁরাই করেন। একবার দামাস্কাসে ভয়ানক দাংগা হয়। দাংগা প্রথম শুরু হয় শিয়া এবং সুন্নিতে, কিন্তু সুন্নিরা চতুরতা করে সেই দাংগা সর্বজনীন করে তুলেন, তারই ফলে এখন বৈদেশিক মূলধনে পরিচালিত ট্রাম কোম্পানী অচল হয়ে গেছে।

পরের দিন পথে পথে দেখলাম ট্রাম লাইন আছে, কিন্তু গাড়ি নেই। শহরটি ছোট বলেই ট্রাম না থাকায় কষ্ট হয় না, কলকাতার মত বড় শহরে ট্রাম না থাকলে আমাদের কত কষ্ট হত, কত লোক বেকার হত, তার হিসাব রাখাও মুস্কিল। আমি যন্ত্রের বড়ই পক্ষপাতী, সেজন্যই দামাস্কাসে ট্রাম উঠে যাবার জন্য দুঃখিত হয়েছিলাম, আনন্দিত হইনি। গরুর গাড়ীর যুগে পিছিয়ে যাবার আমার মোটেই ইচ্ছা নেই।

দামাস্কাস শহরে রেস্তোরাঁর ছড়াছড়ি। পাক করতে কেউ যেন রাজী নয়, সবাই রেস্তোরাঁয় খেয়েই তৃপ্ত। রেস্তোরাঁ হল পলিটিসিয়ানদের মিলনের স্থান, চোর-ডাকাতের পরামর্শের আড্ডা, কূটনৈতিকদের বিশ্রাম-স্থান। রেস্তোরাঁয় চেঁচিয়ে কেউ কথা বলে না। পলিটিক্স নিয়ে বেশ তর্কযুদ্ধ হচ্ছে অথচ অন্য টেবিলের লোক তার সন্ধান পাচ্ছে না। কথাটা অনেকটা আজগুবিই বটে। যারা পলিটিক্স করে তারা ঢাক-ঢোল পিটায় না, কাজ করে। আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করেছিল, জাপান মানচুরিয়া দখল করেছিল, ভারতে নন-কো-অপারেশন জোরের সংগেই চলেছিল, সিরিয়া স্বাধীন হবে কি পরাধীন থাকবে তাই বিবেচনা হচ্ছিল। হিটলার শক্তিমন্ত হয়েছিলেন, ষ্ট্যালিন লোকান্তরালে থেকে রুশ দেশকে তৈরী করছিলেন। ট্রটস্কি উচ্চৈঃস্বরে ষ্ট্যালিনের মৃত্যুকামনা করছিলেন। কলোনিয়েল দেশগুলি ষ্ট্যালিন এবং ট্রটস্কির মতান্তরকে নিজেদের মাঝে টেনে আনছিল। সিরিয়া সেই টানাটানির মাঝে পড়ছিল। সুখের বিষয়, আমি এ বিষয়ে

নীরব থাকায় ভয়ানক বিপদ হতে বেঁচে গিয়েছিলাম। আজ যে বন্ধুত্ব করছে কাল এই মতবাদ নিয়ে একের মুখ অন্যে দেখছিলনা। মারামারি গুলী ছোঁড়া অনবরত চলছিল। কে বলে সিরিয়া রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়ে পিছপাও ? ক্রমাগত এগিয়ে চলছিল। বন্যার জলে ভাসিয়ে দিচ্ছিল ধর্মের বৈষম্য। আমি সেই সময়ে সিরিয়ার গ্রামে গ্রামে ঘুরছিলাম। সেই পুরাতন স্মৃতি মনে করে এখনও নিজেকে আনন্দিত মনে করি।

রাত্রে ফিরে আসার সময় দু'একজন পুলিশ আমার পাসপোর্টের নম্বর টুকে নিয়েছিল। অনেকে বলেছিল "পাকতি"। পাকতি কথাটার অবিকল বাংলা হল "চলে যা"—হেয়-সূচক কথা।

আমি ওদের কথার জবাব না দিয়ে হোটেলে এসে দরজা খুলতেই হোটেল-মালিক এসে বললেন, "পুলিশ এসে খুঁজেছিল।" আমি তাঁকে বললাম,—ভয় নাই, আগামী কাল সবই ঠিক হবে এখানে ম্যাসেজ করার মত লোক আছে? হোটেল-মালিক বললেন, আপনার রুমে কেউ যাবে না। পুলিশের খপ্পরে পড়তে কেউ রাজী নয়। আমি রুমে গিয়ে ভেতর হতে দরজা বন্ধ করে দিয়ে সিরিয়ার মানচিত্র দেখতে লাগলাম।

পর দিন সকালেই স্থানীয় বড় বড় মসজিদগুলিতে গেলাম। বাইরে থেকেই মসজিদের কারুকার্য দেখতে লাগলাম। মসজিদের ভেতর যেতেও নিষেধ নাই। শুধু জুতা খুললেই হল। শহরের প্রাচীনতম মসজিদটি দেখেই একটি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে আর কোন পীঠস্থান আছে কি? তিনি অনেকগুলি গীর্জার নাম আমার নোট-বইয়ে লিখিয়ে দিয়ে একটু হেসে বললেন, এখানে আগাখান মতাবলম্বীদেরও একটা চার্চ অছে, তবে তাতে আপনার প্রবেশ-পথ বন্ধ। বাইরে থেকে দেখে আসতে পারেন। ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে সেদিনের মত ভ্রমণ সপ্তাহ করে ইমিগ্রেসন অফিসে গেলাম।

ইমিগ্রেসন অফিসে আমার পূর্বপরিচিত ভদ্রলোকের কাছে যাওয়া মাত্রই তিনি 'ট্র্যানজিট' ভিসাকে একেবারে এক বৎসরের ভিসা তৈরী করে দিলেন। নূতন ভিসার সাহায্যে আমি সেদিন থেকে এক বৎসর পর্যন্ত সিরিয়ায় থাকতে আদেশ পেয়েছিলাম। ছোকরা ফ্রেন্চ্ কাষ্টম অফিসারের ক্ষমতা এই পর্যন্তই ছিল। আমি নিশ্চিন্তে শহর বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম।

সুন্নি সম্প্রদায়ের মসজিদ সকলের জন্য সকল সময়ই খোলা। রাত্রে মসজিদের চত্বরে অনেক লোক শুয়েও থাকতে পারে। কিন্তু শিয়াদের মস্‌জিদে শুধু নামাজের সময়ই যাওয়া যায়। আগাখানী সম্প্রদায়ের প্রার্থনার স্থানকে মসজিদ বলে না, বলে 'জামায়েত'। তাদের জামায়েতের গঠনও মস্‌জিদের মত নয়। এ যেন একটি অট্টালিকা। শিয়া শ্রেণীর পরিচালনাধীন হিন্দী মস্‌জিদে আমি আমার সাথীদের নিয়ে গিয়েছিলাম। কয়েকজন ভারতীয় বোরা শ্রেণীর বম্বের লোক সস্ত্রীক হজ্ করতে গিয়েছিলেন। তাঁরাও কয়েকদিন বিশ্রাম করবার জন্য সেখানে আস্তানা গেড়েছিলেন। আমাকে পেয়ে তাঁদের বড়ই আনন্দ হয়েছিল এবং তাঁদের সংগে আমাকে থাকতে বলেছিলেন। আমি থাকিনি, তবে মাঝে মাঝে তাঁদের তাঁবুতে গিয়ে ডালভাত খেয়ে আসতাম।

দামাস্কাস হতে একটি বড় তার দেওয়া কালো পথ বেরুত-এর দিকে চলে গেছে। পথ দেখতে বের হয়েছি, এমন সময় পথের ডান দিকে একটি বাংলো ধরণের বাড়ি দেখে তার সামনে দাঁড়ালাম। বাড়ীর মালিক আরব, ধর্মে খৃষ্টান। খৃষ্টধর্ম যাঁরা মেনে চলেন তাঁরা পর্দা মোটেই মানেন না। বাড়ীর সামনে একখানা বাগান। বাগানটির সৌন্দর্য আমাকে টেনেছিল। আমি যখন বাগান দেখছিলাম. তখন ভেতর থেকে এক মহিলা বেরিয়ে এসে ফ্রেন্চ্ ভাষায় আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমি ইংলিশে উত্তর দেওয়ায় তিনিও ইংলিশেই আমার সংগে কথা বললেন।

আমি তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করে বাইরের একটি রুমে গিয়ে বসলাম। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি আমাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করার পর বিকালে তাঁর বাড়িতে পুনরায় যেতে বললেন। আমি তাতে অসম্মতি জানিয়ে দিলাম। তখন তিনি বাধ্য হয়ে আরও নানা কথার অবতারণা করতে লাগলেন।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই শহরে খৃষ্টানদের সংখ্যা খুবই কম, আপনারা পর্দা ব্যবহার না করে কি করে বাইরে যান? আমার কথায় তিনি আশ্চর্য হলেন। বললেন—কেন যাব না, এতে কি কোন আপত্তি আছে, না কেউ পথে অপমান করবে? কথা না বাড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, ইহা নিশ্চয়ই দেশ ও স্থান-মাহাত্ম্য। মুষ্টিমেয় কয়েক ঘর খৃষ্টান আরব তাঁদের প্রচলিত প্রথা মেনে চলছেন অথচ তাঁদের প্রতি কেউ কোনও রূপ অন্যায় ব্যবহার করছে না।

অনেকেই ভাবেন, যদি আরব দেশের কর্তৃত্ব সুন্নি সম্প্রদায়ের হয় তবে ইহুদী, খৃষ্টান এবং অন্যান্য সম্প্রদায় তাকে বাধা দেবে। তা মোটেই সত্য নয়। অনেক ইহুদীর সংগেও আমার কথা হয়েছে, তাঁরা বলেছে, ধর্ম আর রাষ্ট্র আলাদা জিনিষ। রাষ্ট্র নিয়ে যখন কথা হবে, তখন হবে জাতের কথা, ধর্মের কথা নয়। আরবরা ধর্মের কথা এবং জাতীয় জীবনের কথা একত্রিত করে না। ভদ্রমহিলার কথায় বুঝলাম, তাঁরা চান আরব দেশ স্বাধীন হউক, দেশ কে শাসন করবে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে দরকার নেই। দরকার নেই কারণ এখন সমাজ অনেক এগিয়ে গেছে। ধর্মের গরমিলে কারো কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই।

কোনও এক সময়ে নাকি ক্যানাডিয়ান সেপাই দামাস্কাসে এসেছিল। তাদের আচার-ব্যবহার বেশ ভাল ছিল, কিন্তু তারা লোককে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল ধর্মের সম্বন্ধে নানা কথা বলে। তারা চলে যাবার পর দামাস্কাসের লোক বেশ শান্তিতে ছিল। ফ্রেন্চ

সেপাইরা ধর্মের কথা মোটেই আমল দিত না, তারা শুধু আমোদ আহ্লাদ করে দিন কাটিয়ে দিত।

স্থানীয় লোক ফ্রেন্‌চ শাসনে শান্তিতে ছিল না। ফ্রেন্‌চদের শোষণ-নীতি বড়ই মারাত্মক। সাধারণ লোক অতি সত্বর নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ফ্রেন্‌চরা ধর্মে রোমান্ ক্যাথলিক। ভদ্রমহিলাও অর্থডক্স রোমান্ ক্যাথলিক। কিন্তু তিনি ফ্রেন্‌চদের প্রতি একটুও সহানুভূতি দেখাননি। অন্নকষ্ট যেখানে প্রবল, ধর্মের বন্ধন সেখানে থাকতে পারে না। যাদের মাঝে সাধারণ শিক্ষা রয়েছে, জাতীয় ভাব জেগে উঠেছে, সেখানেই এ নিয়ম খাটে। যে-স্থানে এখনও সাধারণ লোক ভগবানের ঘাড়ে সকল দোষ চাপিয়ে নিরীহ গরুর মত কশাইখানায় গিয়ে মরে, সেখানে এরূপ নিয়ম চলে না।

দ্বিপ্রহরে মহিলার ঘর থেকে বের হয়ে হোটেলে ফেরবার সময় পথে একজন সিন্ধি মার্‌চেন্ট-এর সংগে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে তাঁর দোকানে নিয়ে গেলেন। দোকানটি ছোট। দিনের বেলায়ও সেখানে অনেকগুলি ইলেক্‌ট্রিক বাতি জ্বলছিল। দোকানের ভেতর গিয়ে দেখি অনেক ক্রেতাই সিল্ক কিনতে ব্যস্ত। তাতে আরবই বেশী। মেয়েলোকও আছেন। আরব মেয়েরা বোরখা পরে বাজারে যেতে পারেন। বাজার করতে অথবা বাইরে যেতে তাঁদের কেউ বাধা দেয় না। তাঁদের সংগে পরিবারস্থ কোন লোকও থাকে না। আমার মনে হল, এঁরা শুধু বোরখাই পরেন, নতুবা এঁরা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের চেয়ে অনেকটা স্বাধীন।

আমরা দোকানে বসলাম না। দোকানের ভেতর প্রাইভেট চেম্বারে বসেই কথা বলতে লাগলাম। দোকানী পুরাতন যুগের মত মেনেই চলেন। তাঁর অন্যান্য কর্মচারীরা নতুনের পূজারী। এই নিয়েই তিনি কথা বলতে লাগলেন। সর্বপ্রথম তিনি সিরিয়ার লোকের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে প্রশংসা করলেন। তারপর ইউরোপীয়দের মত আরবগণ পোষাক-পরিচ্ছদ পরা সুরু করেছে বলে

নিন্দা করলেন। আমি তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে যাইনি, শুধু শুনছিলাম। তাঁর ছেলে কিন্তু প্রতিবাদ করতে ছাড়ল না। এটাও লক্ষ্য করে দেখলাম, দোকানের মালিক দু'চার কথা বলেই আমাকে বিদায় দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যুবকরা আমাকে আটকিয়ে রাখল, তারপর বাড়িতে নিয়ে গেল খাওয়াতে। বৃদ্ধ মহা বিপদে পড়লেন। এরূপ মহার্ঘ স্থানে একটা লোক অনর্থক খেয়ে যাবে তা কম ক্ষতিকর নয়, এই ভেবেই বোধ হয় তিনি মাথায় হাত দিয়েছিলেন। ছেলেরা আমাকে ভূরিভোজন ত করালই, উপরন্তু বিদায়ের বেলা দেড়শত ফ্রাংক পকেটে গুঁজে দিল। বৃদ্ধ আর সহ্য করতে না পেরে আমায় তাঁর বাড়ি হতে চলে যেতে বললেন। আমি আর বেশিক্ষণ না বসে হোটেলে চলে এসে ভাবতে লাগলাম, এত টাকা পেয়েও বৃদ্ধ লোকটির ধন পিপাসা মিটছে না কেন? লোকে বলে ধন-পিপাসার অন্ত নাই। তারই বা কারণ কি? যাদের ভবিষ্যৎ আয়ের নিশ্চয়তা নাই, তাদেরই ধন-পিপাসা মেটে না।

সেদিনই সন্ধ্যার পর আবার কাফেখানাতে গেলাম। আরব দেশের কাফেখানাগুলিই প্রসিদ্ধ। যখনই কারো কোন কাজ থাকে না, তখনই কাফেখানায় গিয়ে তারা বসে। কাফেখানাতে বসার সুবন্দোবস্ত আছে। কাফেতে ইজি-চেয়ারও আছে। আরবের অনেক দোষ-গুণ আমরা পেয়েছি। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের হোটেলগুলিও আরবদের প্রথামতই গড়ে উঠেছে, কিন্তু আরব দেশে দোকানের সামনে পাক করার ব্যবস্থা নাই। তারা পাক করে ভেতরে, খায় বাইরে। আমাদের দেশে খাবার তৈরী হয় ঘরের দরজার কাছে, আর লোকে তাই খায় ঘরের ভেতর বসে। আরবি প্রথাটা এখানে বোধ হয় আমরা ঠিক ঠিক ভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হইনি। তবে ছোটখাটো খাবারের দোকানে আমাদের দেশের মিঠাই-এর দোকানের মত দরজার সামনে খাবার তৈরী হয়। এরূপ দোকানে শিক্ষিত আরব কখনও যায় না।

সেদিন আমি উচ্চশ্রেণীর আরবদের কাফেতে না গিয়ে নিম্নস্তরের একটি খাবারের দোকানে গিয়েই বসলাম। কতকগুলি নোংরা ছেলেমেয়ে তেলে ভাজা মাছ কিনতে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। তারা প্রত্যেকেই মাছভাজা কিনে তৎক্ষণাৎ খেয়ে ফেলছিল। আরব দেশে পাতার অভাব, তাই হাতেই পরিবেশন করা হচ্ছিল। আমিও হাত পেতে দাঁড়ালাম। দোকানী আমার দিকে বার বার চেয়ে দুখানা মাছভাজা আমার হাতে দিল। কুড়ি সেন্তিম দিয়ে তাই খেতে আরম্ভ করলাম। মাছের ভাজাগুলি বেশ ভালই লাগছিল, কিন্তু বেশী নুন দেওয়ায় দুখানা ভাজাই আমি খেতে পারছিলাম না। ইউরোপীয় পোষাকে আগত একটি লোককে মাছভাজা খেতে দেখে আশেপাশের দোকান থেকে লোক ভিড় করতে লাগল।

আমাদের দেশের লোক যে কোন বিদেশী ভাষা শিখতে প্রয়াসী হবামাত্রই সর্বপ্রথম ব্যাকরণ শিখে, আরবরা তা করে না। তারা শব্দের অর্থ শিখে এবং শব্দ ব্যবহার করে। ব্যাকরণের দিকে ফিরেও তাকায় না। আরব দেশে কিন্তু দরকারের তাগিদে পুরাতন নিয়ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। এতে ফল ভালই হয়েছে। অনেক ছেলে-মেয়ে বেশ ইংলিশ এবং ফ্রেন্চ্ ভাষা বলতে পারে।

লোকের ভিড়ে দাঁড়াতে ভালবাসি না; তাই হাতটা রুমালে মুছেই এগিয়ে চলছিলাম। কিন্তু এখানের লোক বড়ই কৌতূহলী। দু'একজন আমার পেছন নিল। তারা আমার কাছে এসে কি বলছিল, আমি তাদের একটা কথাও বুঝতে সক্ষম হইনি। শুধু বলেছিলাম "ছাইয়া দুনিয়া" অর্থাৎ ভূপর্যটক।

তখনকার দিনে জার্মানরাই দেশ-বিদেশে পায়ে হেঁটে, নৌকায়, সাইকেলে বেড়াত। তারা আমাকে জার্মান ভাবেনি, দক্ষিণ দেশের আরব ভেবেছিল, কিন্তু একটি আরবী কথা বলতে সক্ষম না হওয়ায় সকলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছিল। এদের হাত থেকে

রক্ষা পেয়ে, আর কোথাও মাছ ভাজা খাবার জন্য দাঁড়ালাম না। একটি বড় কাফেতে গিয়ে আরাম করে একখানা ইজি চেয়ারে বসলাম। এখানে কাফির দাম এবং অন্যান্য খাদ্যের দাম সিট অনুযায়ী। আমি ভাল সিটে বসবার জন্য প্রত্যেকটি জিনিষের দাম তিন গুণেরও বেশি দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমার স্বচ্ছলতা দেখে কাছে বসা দু'একজন ব্যবসায়ী আমার সংগে পরিচয় করলেন। এসব কাফেতে ভাষার কোনও অভাব হয় না। আরবরা সুযোগ পেলেই অতি অল্প সময়ের মাঝে বিদেশী ভাষা শিখতে সক্ষম হয়।

কাফে থেকে বের হয়ে শহরের বিশিষ্ট কয়েকটি পথ বেড়াবার সময় একটি ঘটনা দেখে দাঁড়াতে হয়েছিল। একটি আরব ভুল করে এমন একটি পথে এসে পড়েছিল যে, সে পথে উট চলা নিষিদ্ধ। দামাস্কাস শহরে গৃহপালিত জীব রাখতে দেওয়া হয় না। উট শহরের সর্বত্র আসতে পারে না। শহরের আইন না জানা লোকটি যখন উটের পিঠে বসে নিষিদ্ধ পথে যাচ্ছিল, তখন কতকগুলি লোক তাকে দাঁড় করিয়ে ফিরে যেতে বলে। লোকটি ফিরে যেতে চায়, কিন্তু উট নিষিদ্ধ পথেই চলতে চায়। উটকে ফেরান মহা কষ্টকর ব্যাপার হয়েছিল। অতি কষ্টে সকলের চেষ্টায় উট বিপরীত দিকে যেতে লাগল। উটের মালিক সকলকে চীৎকার করে জানাল, এদিক হতে ঝড় আসছে, হুঁসিয়ার হয়ে থাক। এমন সুন্দর রাতে ঝড় হবে তা আমাদের ধারণার অতীত ছিল, কিন্তু আধ ঘণ্টার মাঝেই প্রবল ঘূর্ণি বায়ু বইতে লাগল। মরুভূমির বালুকণা ঝড়ে বয়ে এনে আকাশ অন্ধকার করে ফেলল। এরূপ ঝড়ের অভিজ্ঞতা আমার ছিল; সেজন্য যথাসময়ে হোটেলে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলাম।

পরের দিন সকাল বেলা ইমিগ্রেসন অফিসে গিয়ে পরিচিত সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম। সকাল বেলায় তত গরম ছিল না, তাই আরাম করে পথ চলতে লাগলাম। বড় চকের

কাছে এসে দেখা হল একটি কংকণী মুসলমানের সংগে। সে বম্বের লোক, ভাষা তার কংকণী, অতএব তাকে আমি কংকণী বলেই বলব।

কংকণী নাবিক অনেক দেশ ভ্রমণ করেছে। তার ইচ্ছা হয়েছিল মুসলমানদের ধর্মস্থানগুলি দেখা। তাই দেখতে অনেক দিন কাটিয়ে দামাস্কাসে পৌঁছে। এখানে আসার পূর্বেই তার মনে জাতীয় ভাবের বীজ বপন হয়েছিল। বেরুতে আসার পর স্থানীয় জাতীয়তাবাদীর সংগে কংকণী বেশ ঘনিষ্ঠ ভাবেই মিশতে সক্ষম হয়েছিল এবং বুঝতে পেরেছিল ধর্মই যথাসর্বস্ব নয়। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সময়ও মান-ইজ্জতের দরকার হয়। মান-ইজ্জত বজায় রাখতে হলে জাতীয় স্বাধীনতা না থাকলে চলে না।

আমার সংগে কংকণীর দেখা হবার পর উভয়ে মিলে হোটেলে আসি এবং দুজনায় মিলে দেশ-বিদেশের নানা কথা বলি। আমার ভ্রমণ-কাহিনী শুনে কংকণী আমার সংগী হতে চায়। পাসপোর্ট তার ছিল না, তাই তাকে কোন মতেই সংগী করতে সক্ষম হলাম না। তার সংগে কথা রইল, যতদিন সিরিয়াতে থাকব, ততদিন আমরা একত্রে থাকবার চেষ্টা করব।

আমি এবার বেরুতে যাব। তাই তাকে বেরুতের বাসে বসাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। বিকাল বেলা কংকণীকে বাসে বসতে দিতে সক্ষম হলাম। শুনছিলাম বেরুতে একজন মুসলিম হিন্দি আছেন, তাঁর নাকি একখানা মসজিদও আছে; কথা রইল আমরা হয় সে মসজিদে, নয়ত মুসলিম হিন্দির বাড়িতে গিয়ে মিলব। কংকণী সন্ধ্যার বাসেই বেরুতের দিকে রওয়ানা হল। বাস না ছাড়া পর্যন্ত আমি বাস-ষ্ট্যাণ্ডে ছিলাম।

বেরুত শহরটি কিরূপ হবে এবং দামাস্কাস হতে কত দূর তা আমার ধারণাই ছিল না। দামাস্কাস থেকে বেরুতের দিকের পথ ক্রমশঃই উঁচু হয়ে চলেছে। সে জন্যই পথ চলতে দেরী হতে লাগল।

মরুপথ এখনও শেষ হয়নি। এখনও পাহাড়গুলিতে বৃক্ষ লতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। মরুভূমির ভেতর দিয়েই চলেছি বলেই মনে হচ্ছিল। উপর দিক থেকে অর্থাৎ বেরুত-এর দিক থেকে একজন উট-সওয়ার আসছিল। তার হাতে একটা লম্বা রশিতে একজন দাড়িউস্ বাঁধা ছিল। লোকটির আকৃতি বেদুইনের মতই, তবে তার প্রকৃতি আমার জানা ছিল না। শুনেছিলাম দাড়িউস্‌রা (Druses) পর্বতে বাস করে এবং এখনও তারা অসভ্য। কিন্তু লোকটিকে যে ভাবে উটের পেছনে হাটিয়ে নেওয়া হচ্ছিল তাতে ফ্রেন্‌চদের সভ্যতার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না। কশাইখানাতে জীবজন্তু হত্যা করা হয়, জেলের দেওয়ালের মধ্যে অনেক দেশ-প্রেমিকের উপরও অত্যাচার করা হয়, কিন্তু তা লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘটে। সর্বসাধারণের পথে একটা লোককে পশুর পেছনে বেঁধে নিয়ে যাওয়া কিরূপ সভ্যতা তা আমি বুঝতে পারছিলাম না। লোকটির মুখ হতে ফেনা বের হয়ে আসছিল, চলতে পারছিল না, তবুও তাকে টেনে নেওয়া হচ্ছিল। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে সে দৃশ্যটা দেখে মুখ ফেরাতে বাধ্য হয়েছিলাম। চলার পথে ভাবছিলাম, কোন্ দোষে আরবগণ এত হীনবীর্য হয়ে পড়ল।

সারাটি সকাল সাইকেল চালিয়ে দ্বিপ্রহরে একটি তাঁবুর কাছে এসে দাঁড়ালাম। বহু দিন হয় নমস্কার কথাটা বলিনি, কারণ এখন আর আমাকে পরিচয় দিতে কষ্ট হয় না। হিন্দি বললেই হয়। এদিকে এক শ্রেণীর লোকের কাছে হিন্দী, অর্থাৎ ভারতবাসীর বেশ সম্মান আছে। এরা ভাবে হিন্দুস্থান পরীর দেশ। হিন্দুস্থানে নাকি নদীর জল খেজুরের রসের মত মিষ্টি, পথে ঘাটে সোণার তাল গাছ আছে। হিন্দিরা টাকার পরিবর্তে মণি-মাণিক্য ব্যবহার করে।

একটি তাঁবুর কাছে এসে আজ নমস্কার কথাটা মুখ হতে বের হয়ে গেল। সুখের বিষয় কেউ শুনেনি। তাঁবুটি বেশ ছোট।

তাঁবুর চারদিকে ঘেরাও ছিল না। এটাকে তাঁবু না বলে যদি বলা হয় একখানা পুরাণো মোটা ময়লা কাপড়কে চারিটা খুটির ওপর বেঁধে রাখা হয়েছে, তবেই কথাটা ভাল করে বোঝা যাবে। এরই তলায় বসে একটি আরব অর্ধ-মুদিত নয়নে পূর্বদিকে চেয়ে রয়েছিল, অপর দিকে একটি ছোট মেয়ে তার গলার 'তাগা'য় কতটি গ্রন্থি আছে গুণছিল, মাঝে মাঝে 'তাগা'র গ্রন্থিতে কাপড়ও দিচ্ছিল। আমাকে দেখেই মেয়েটি তার বাপকে সাপটিয়ে ধরল। তার বাবা আমার দিকে তাকাল। আমি তাকে নমস্কার করলাম, সে আমাকে কাছে গিয়ে বসতে বলল। আমি কাছে বসেই একটি সিগারেট আরবটির হাতে দিলাম। আরব চকমকিতে ঠোকা দিল। আমি ভাবলাম, আজ এখানেই রাত কাটাতে সক্ষম হব। দুজনায় মিলে দুটা সিগারেট ফুকার পর আমি আমার খদ্দরের চাদরখানা কতকগুলি পাথর সরিয়ে দিয়ে বিছিয়ে ফেললাম। যায়গা বেছে নেবার জ্ঞান আছে দেখে আরব সুখীই হল।

মরুভূমিতে হিংস্র জীব নাই এটাই সকলের ধারণা, কিন্তু উত্তপ্ত বালুকণার মাঝেও নানারূপ জীবের জন্মমৃত্যু হয়। এসব জীবের জন্মমৃত্যুর সংবাদ মরুবাসীরাই জানে। আমাদের মত সাধারণ লোক সে সংবাদ রাখতে সক্ষম হয় না। আমরা মরুভূমির আকাশ বাতাস এবং ধূসর বর্ণের সূর্যের কথাই ভাবি। মরুভূমিতে পাথরের আকৃতি-বিশিষ্ট ছোট বড় পোকা হয়। এই পোকাদের দেখলে মনে হয়, যেন একটা পাথরের টুকরাই পড়ে আছে। কিন্তু যদি উঠিয়ে দেখা যায় তবে দেখতে পাওয়া যায়, একটি বিষাক্ত পোকা হাঁ করে খাদ্যের জন্য অপেক্ষা করছে।

সন্ধ্যার পূর্বে আরও দুই জন আরব এবং তিনটি স্ত্রীলোক এসে পূর্বপরিচিত লোকটির সংগে যোগ দিল। আরব দেশে কার কোন্ ধর্ম তা জিজ্ঞাসা করা অথবা গায়ে পড়ে কোন ধর্মকথা আলোচনা করাও নীতি-বিরুদ্ধ। আমি নীরবেই তাদের সংগে খাওয়া-দাওয়া

করলাম এবং প্রত্যেককে একটা করে সিগারেট দিয়ে আপন বিছানার ওপর এসে বসলাম।

বিদেশে একাকী চলতে হলে বড়ই হুসিয়ার হয়ে দিন কাটাতে হয়। আগত মেয়েলোকরা যুবতী। যুবতী স্ত্রীলোকের দিকে খরদৃষ্টি নিক্ষেপ অথবা হাঁ করে তাকিয়ে থাকা আমাদের দেশেই সম্ভবে, পৃথিবীর অন্যত্র সেরূপ কিছু করলে শুধু অপমানিত হলেই মংগল; ঘাড়ে মাথা থাক্‌লেই রক্ষা। কিন্তু আমার কৌতূহলী দৃষ্টি স্ত্রীচরিত্র পাঠে নিয়োজিত ছিল। আমি লক্ষ্য করছি, এদের মাঝে পর্দাপ্রথা আছে কিনা? গরীব গরীবই। গরীবের জন্য পর্দাপ্রথা নেই। কর্ম আছে, বাজে ধর্ম নেই; গরীবের আশ্রয়স্থল জংগল। এরাও জনহীন মরুভূমিরই একপাশে পড়ে আছে।

এখানে রাত কাটানো কষ্ট হল। গভীর রাত্রে শীতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। এরা কিন্তু আরামে মেষ চামড়া দিয়ে শরীর ঢেকে নাক ডাকাচ্ছিল। অতি কষ্টে রাত্রি প্রভাতের বহু পূর্বেই খদ্দরের টুকরাটা উঠিয়ে সাইকেলটা পথে এনে ওদের জাগাবার জন্য গান ধরলাম। আমার সুমিষ্ট স্বরে ওদের ঘুম ভেংগে গেল। কুকুর থাকলে আমার গান শুনে হয়ত আমাকে আক্রমণই করত। সুখের বিষয়, এরা আমাকে গাল দেয়নি, তবে বুঝতে পেরেছিলাম, অসন্তুষ্ট হয়েছে। এদের কাছে বিদায় নিয়ে বেরুতের দিকে অগ্রসর হলাম।

পাহাড় উৎরে পথ পাহাড়ের ওপরই একটি ছোট গ্রামে এসে থেমেছে। গ্রামের বাসিন্দা সবাই খৃষ্টান। গ্রামের আকৃতি এবং প্রকৃতি একেবারে ইউরোপীয়। এখানে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে মদ বিক্রি হতে দেখলাম। মেয়েলোক সবাই ইউরোপীয় পোষাকে আবৃত। পুরুষরা অর্ধেকটা ইউরোপীয়, অর্ধেকটা পুরাতন তুরুক ফ্যাসান মেনে চলেছে। অবশ্য যে পোষাকের কথা বললাম তা কৃষক শ্রেণীতেই প্রচলিত। যারা ব্যবসা করে, তারা একেবারে ইউরোপীয় পোষাকই পরে।

গ্রামের চারদিকে আংগুরের এবং নানারূপ ফলের বাগান। দূরে ভুট্টা ও যবের ক্ষেত। গ্রাম একদম গ্রীক ধরণের। দুদিকে সারি দিয়ে বাড়ি। বাড়ির সামনে ফুটপাত, তারপর মস্তবড় একটা রাস্তা। প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে বড় বড় গাছ। যারা কাজে যায় নি, তারা গাছের তলায় বসে কথা বলছিল। ওদের ভাষা আরবী। গ্রামের একপাশে একটা প্রকাণ্ড চার্চ। আমি সর্বপ্রথম চার্চটিই দেখলাম। মনে হল বহু পুরাতন সে বাড়িটা। তারপর গেলাম হোটেলে। হোটেলটি সুন্দর। তাতে বড় বড় আসবাবপত্র সাজানো রুম রয়েছে। চল্লিশ ফ্রাংক দিয়ে একখানা রুম ভাড়া করলাম। তখন বাহাত্তর ফ্রাংক এক ষ্টারলিংএর সমান ছিল। অতএব রাত্রি বাসের জন্য আমাকে প্রায় আট টাকার মতই দিতে হল। খাবারের জন্য আরও চল্লিশ ফ্রাংক খরচ হয়েছিল। কিন্তু এত খরচ করেও আমি ঘাবড়িয়ে যাইনি। পরদিন সকালে হোটেল মালিকের কাছেই একখানা সাহায্যলিপি অথবা পর্যটকের পোষ্টকার্ড বিক্রি করে দশ ফ্রাংক পাই। গ্রামের কোন পরিবারই আমাকে দু' ফ্রাংকএর কম দেয়নি। এতে আমার প্রায় দু'শ ফ্রাংক চাঁদা উঠে। এদিকে লোক বিদেশীকে এরূপ ভাবেই অতিথি-পরায়ণতা দেখিয়া থাকে। অতিথি একজনের নয়, সমগ্র গ্রামের। গ্রাম্য হোটেলে থেকে গ্রামের উৎপাদিত আটার রুটী, ভাল মাংস, উত্তম ফল এবং সুস্বাদু পানীয় পান করবে, এই ধারণাই এখানকার লোক পোষণ করে। এদের গ্রাম্যজীবন আরামদায়ক।

সকাল বেলা ছোট গ্রাম হতে বের হয়ে বেরুতের দিকে অগ্রসর হলাম। দুদিকে পর্বতমালা। তারই উপর দিয়ে প্রশস্ত সুন্দর পথ বেরুতের দিকে চলেছে। পথের পাশে গ্রামের নামগন্ধও নাই। মাঝে মাঝে পেট্রোল পাম্প। তাই আশ্রয় করে একখানা রেস্তোরাঁ, কোথাও বা একখানা হোটেল জন্ম নিয়েছে। হোটেল এবং রেস্তোরাঁ খাঁটি ইউরোপীয় ধরণের গড়া হয়েছে। হোটেল,

রেস্তোরাঁ এবং পেট্রোল পাম্প-এর মালিকরা প্রায়ই গ্রীক্। গ্রীক্রা নানা ভাষায় অভিজ্ঞ। একজন লোককে অনেক ভাষা বলতে দেখলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে অবগত হলাম, বিদেশী ভাষাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করা গ্রীকদের পক্ষে কষ্টকর নয়, কারণ সকল ভাষাই গ্রীক্ ভাষা হতে বের হয়েছে। তবে একটি বিষয় লক্ষ্য করে দেখলাম, গ্রীকরাই এ অন্চলে দোভাষীর কাজ করে। তুর্কী ও আরবে যখন ঝগড়া হয়, তখন তুর্কী কখনও আরবি ভাষা বলে না, আরবও তখন আর তুর্কী ভাষা বলতে চায় না।

ফ্রেন্চ ভাষা এদিকে শত্রুতা এবং মিত্রতার গণ্ডি এড়িয়ে লিংগুয়া ফ্রেংকায় পরিণত হয়েছে। গ্রীকরা ফ্রেন্চ ভাষায় অভ্যস্ত, সেই জন্য গ্রীকরা দোভাষীর কাজ করতে পারে। এতে গ্রীকদের প্রতিপত্তি বেশ বেড়ে চলেছে।

গ্রীক হোটেলে আরব কুক নিযুক্ত করা হয়। কুক খালি মাথায়ই কাজ করে। খালি মাথায় কাজ করা গুরুতর পাপ। খালি মাথায় খাদ্য এনে দেওয়া আরবি সভ্যতায় ঘা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। একদিন আরবরা শিরস্ত্রাণহীন লোককে দরিদ্র ভেবে ছেড়ে দিত, দাম্ভিক হলে শিরশ্ছেদ করত। কিন্তু আরবরা এখন এসব দিকে মাথা ঘামায় না। তারা চায় স্বাধীনতা! কি করে স্বাধীন হতে পারা যায়, সেই কথা বল, দেখবে আরব যুবকগণ তোমার সংগ নিয়েছে।

পথ ক্রমেই ঢালু হয়ে চলেছে। ব্রেক ছেড়ে দিয়ে পূর্ণ বেগে আমি চলছিলাম, আর দেখছিলাম দুদিকের দৃশ্যাবলী। আমার মন তখন নানা চিন্তায় নিমজ্জিত ছিল। তখন আমি মনুষ্য-বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করতাম, সেজন্যই এই জায়গাটা আমার কাছে এত ভাল লাগছিল। আমি ভাবছিলাম দ্রাবিড়দের কথা। এখানে এরা কি করে এসেছিল এবং কখন এসেছিল? কিন্তু দুঃখের বিষয় পথ পথই। অবাস্তব নয়, একেবারে খাঁটি। পথটা ছিল এক স্থানে

ফাঁটা। ফাঁটা স্থানটার কাছে এসে যদিও আমি বেশ সাবধানতার সহিত ব্রেক কষছিলাম, তবুও রক্ষা পেলাম না। ফাঁটা স্থানে এসেই সাইকেলের পিছনের চাকার টিউব বার্ষ্ট করল। সাইকেল হতে নেমে একটু এগিয়ে গিয়েই একটা লোককে দেখতে পেলাম। লোকটা জাতে আরব, সে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছিল। তার সেই হাসি আমার অন্তরে ভয়ানক আঘাত করছিল। আমি সহ্য করতে না পেরে সাইকেল হতে নেমেই লোকটার আস্তিনে ধরে একটা ঝাঁকানী দিয়ে হিন্দুস্থানীতে বললাম, "এরূপ ভাবে হাসা বে-আদবী।" এতে লোকটা একদম ঘাবড়ে গিয়েছিল।

নিকটেই একখানা সাইকেলের দোকান ছিল। সেখানে গিয়ে সাইকেল মেরামত করলাম। তারপর সেই লোকটার মুচ্‌কে হাসির সংগে আমাদের দেশের বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের তুলনা করছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল আমাদের দেশের অর্থাৎ বংগদেশের কোন ব্রাহ্মণের শরীরে এক বিন্দুও আর্যরক্ত নাই; এরা সবাই সিমেটিক অর্থাৎ আরব। আমার সে ধারণা এখনও বলবৎ রয়েছে। কালিদাসের সময় হতে আজ পর্যন্ত খগ-নাসার কত বাহাদুরীপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে যার ফলে তিল ফুল কবিদের কাছে প্রিয়বস্তু হয়ে উঠেছে। কিন্তু নরডিক জাতের মধ্যে "তিল ফুল জিনি" কোন নাক দেখা যায় না। জু, আরব এবং কতকগুলি ভারতীয় ব্রাহ্মণদের নাকই তিলফুলকে পরাজিত করেছে বলা হয়েছে।

উঁচু হতে নীচে নেমে এসে আর একটা টিলার উপর আসতেই একটি দৃশ্য দেখতে পেলাম। সে দৃশ্য দেখবার জন্য সাইকেল হতে নেমে দাঁড়ালাম। সে দৃশ্য নয়নাভিরাম। আমার ডানদিকে একটি বিশাল শান্ত, নীল সমুদ্র। তাতে নানা দেশের ছোট বড় অর্ণবপোত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর মত ভাসছে। আর সামনে ছোট বড় অট্টালিকাপূর্ণ একটি নগর। নগর এখনও বহু দূরে, তবু নিকটে বলেই মনে হচ্ছে। নগরের দিকে নানা রূপ যান যাচ্ছে আর বের হয়ে আসছে। নগর

যেন একটি ছবির মতই দেখাচ্ছে। আমি দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য অনেক ক্ষণ দেখলাম। অনেক ক্ষণ সে দৃশ্য দেখে চোখের তৃপ্তি হল না। পথ চলতে আরম্ভ করলাম।

ঘণ্টা দুই পথ চলে বেরুতের সহরতলীতে এলাম। সহরতলীতে ছোট বড় দোকান রয়েছে। সর্বপ্রথম গেলাম একটা ছোট সাইকেল মেরামত করবার দোকানে। দোকানী জাতে আর্মানী। পোষাক তার একদম ইউরোপীয়। চাল-চলনও তথা। সে অনেক ক্ষণ আমার সাইকেলটা দেখে বলল, আধ ঘণ্টার মাঝে টায়ারটি একদম নতুন করে দিতে সক্ষম হবে। আমি তাতে রাজি হলাম। দুজন লোক চটপট করে টায়ার খুলে নিয়ে কাজ আরম্ভ করল। আধ ঘণ্টার মাঝে সে টায়ারটিকে মেরামত করে হুইল লাগিয়ে দিয়ে নিজের বিদায় সম্ভাষণ জানাল।

আমি সহরের দিকে চললাম। বেশী ঘোরাফিরা না করে একটি আরব লজিং-এ স্থান নিলাম। আরব লজিংয়ের মালিক একজন আরব মহিলা। ইংলিশ এবং ফ্রেন্চ বেশ বলতে পারেন। একটি রুমের জন্য কত রোজানা দিতে হবে তিনি নিজেই বললেন। মহিলা ইউরোপীয় পোষাক-পরিহিতা ছিলেন। স্নানের ঘর, বসার ঘর দেখিয়ে দিয়ে চাকরদের সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি স্নান করে নিকটস্থ রেঁস্তোরাঁয় গিয়ে খেয়ে এসে সেদিনের মত বিশ্রাম করতে লাগলাম। সন্ধ্যার পরও বাইরে কোথাও যাইনি। হোটেলের অন্যান্য বাসিন্দাদের সংগে কথা বলে নানারূপ সংবাদ নিয়েই সেদিনের মত বিশ্রাম করতে গিয়েছিলাম।

রুমটি চমৎকারভাবে সজ্জিত। প্রত্যেকটি দেয়ালে নানারূপ লতাপাতা আঁকা ছিল, পাখী তাতে চুপটি করে বসে আছে, জল তরঙ্গায়িত হচ্ছে। রুমের দৃশ্য দেখতে দেখতেই শুয়ে পড়েছিলাম।

পরদিন প্রাতে বেরুতের বুকের উপর সাইকেল চালিয়ে সমস্ত শহরটা দেখে নিলাম। এরূপ দেখার সমূহ দরকার আছে। এতে

শহরের আয়তন এবং কোন্ পাড়ায় কত লোক থাকে জানতে পারা যায়। তারপর বিকাল বেলায় পায়ে হেঁটে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।

বেরুত একটি বন্দর। তার ডকে নানা দেশীয় বাণিজ্য-পোত বাঁধা ছিল। কোনটাতে মাল বোঝাই হচ্ছিল, আর কোনটা হতে মাল নামান হচ্ছিল। বিকালবেলা ডকে বসে ডকের দৃশ্যই দেখছিলাম। নিগ্রো, গ্রীক, আরব, মাল্‌টিজ, সাইপ্রাসী, শ্লাভ্, ম্যাসিডনিয় এবং অন্যান্য মজুর বেশ মন দিয়ে কাজ করছিল। এদেশে তুর্কীরা পূর্বেও মজুরী করত না, এখনও করে না। তুর্কীরা ছিল এদেশের শাসনকর্তা। মজুরী করাটা তাদের পোষাত না। বর্তমানে ফ্রেন্‌চরা এদেশের শাসনকর্তা। এজন্য কোন ফ্রেন্‌চ মজুরও ডকে কাজ করছে না।

যেখানে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ রয়েছে, সেখানে অন্য সম্বন্ধ থাকতে পারে না। তুরক এবং ফ্রেন্‌চদের অবস্থাও তাই। ফ্রেন্‌চরা আর খৃষ্টানদের সংগে ধর্ম সম্বন্ধ ছেড়ে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ করেছে। তুর্কীদের কথা বলাও বৃথা। তারা যে পূর্বে একদিন এদেশে রাজত্ব করত তার মদগর্ব এখনও ভোলেনি। তুর্কীতে যাবার পর আমাকে অনেকেই আরব ধারণা করে অপমান করত। আমি যে আরব নই, সে কথা অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ করিনি। আরব দু'রকমের। সাদা এবং কালো। কালো আরবদের উৎপত্তি নিগ্রো এবং সাদা আরবদের সংমিশ্রণে হয়েছে। কালো আরবদের দেশে যেমন সম্মান নাই, বিদেশেও সেইরূপ। আমি কালো আরব বলেই ঘৃণিত হয়েছি। ঘৃণিত হয়েছি বলেই আমার ভেতরে যত কুসংস্কার ছিল সব দূর হয়েছে। আমার 'বিশ্বাস' উপাধি আছে বলে দেশে আমাকে নীচ শ্রেণীর হিন্দু বলে অনেকেই ভাবে। এতে আমার ক্ষতি হয়নি, বরং ভালই হয়েছে। ভুয়া জাত্যভিমানের মদগর্ব ফিরে আসার সুযোগ আর পাবে না।

বেরুতে হিন্দী মসজিদ বলে কিছুই ছিল না। কংকণী মুসলমানটি হিন্দী মসজিদ না পেয়ে কোথায় চলে গিয়েছিল, তার সন্ধান সহজে করতে পারিনি বলে দুদিন বড়ই মনের কষ্টে ছিলাম। তৃতীয় দিন একটি সিন্ধির দোকানে গিয়ে জানলাম, কংকণী মুসলমান আমার খোঁজে সেখানে গিয়েছিল। অনেক খুঁজে একটি মুসলিম হিন্দীর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। কংকণী মুসলমানটি তারই আশ্রয় নিয়েছিল। আমাকে দেখামাত্রই সে আমাকে জড়িয়ে ধরল এবং বলল, "আউর তুমকো নেহি ছুড়েংগে।" আমি ভাবিছলাম এটা বন্ধন নয়, মুক্তির পথ। আমি সাইকেলের ভবঘুরে আর ঐ লোকটি জাহাজী ভবঘুরে।

কোনও এক ভারতীয় মুসলমান এখানে এসে এক আরব রমণীর পাণিগ্রহণ করেন, তারই সন্তান এই হিন্দী ভদ্রলোক। আমি পূর্বে এই লোকটিকে মুসলিম হিন্দী বলেছি। কারণ তাঁর ধর্ম বৌদ্ধধর্ম নয়। এখানেও অনেকে মনে করে, ভারতে বৌদ্ধ এবং মুসলিম এই দুই ধর্মই প্রচলিত। ভারতবাসীকে এখানকার লোক হিন্দী বলে। হিন্দু শব্দের অপভ্রংশ বোধ হয় হিন্দী।[১] যে সকল ভারতবাসী হজ করতে যান তাঁদের হিন্দীই বলা হয়। বেরুতে একটি মাত্র হিন্দী পরিবার থাকায় সকলের কাছেই এই পরিবারটি পরিচিত। আমাকে হিন্দী লোকটি সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। বাস্তবিকই এঁদের মাঝে প্রাণ আছে।

কংকণীকে নিয়ে আমি সমুদ্রতীরে ফিরে এলাম। সমুদ্রতীরের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম, তখন পথে পড়ছিল সেই সিন্ধীর দোকান। সেখানে ফেজ মাথায় একটি লোক বসেছিলেন। কথা বলে জানলাম, তিনি ব্রহ্মদেশ হতে হজ করতে এসেছিলেন। তাঁর মাথায় শুধু ফেজই আছে; পরণে ইউরোপীয় পোষাক এবং তিনি ইসলামের একান্ত ভক্ত। এই লোকটির কাছে কংকণী গিয়ে আমার কথা

১ হিন্দ্—ইণ্ডিয়া, ভারতবর্ষ; হিন্দের অধিবাসী এই অর্থে হিন্দী বা হিন্দি।—প্রকাশক।

জিজ্ঞাসা করেছিল। কংকণী কথার জবাব পায়নি। তাকে অবজ্ঞা করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কংকণী আমাকে সে কথা বলেছিল।

কংকণীকে সংগে করে সমুদ্রতীরে এলাম। মৃদু মন্দ শীতল বায়ু বয়ে চলেছিল। সমুদ্র নীরব এবং নিস্তব্ধ। হাইফা যাবার পথটার দিকে আমি তাকিয়ে রয়েছিলাম। এপথ আমার জন্য বন্ধ। আমার কাছে পঞ্চাশ পাউণ্ড ছিল না বলে আমি এপথে যেতে পারছিলাম না। দরিদ্রের পথ চারদিকে ধনীরা বন্ধ করে রাখতে চায়। দূরদেশে আমরা শুনি, আরবগণ ইহুদীদের দেখতে পারে না, দেশ হতে তাড়াতে চায়। কথাটা কিন্তু একদম খাঁটি নয়। দুনিয়ার সকল ইহুদী যদি আরব দেশে চলে আসে, তাতে আরবের কি এল আর কি গেল ? তবে কেন এসব বাজে কথা শুন্‌তে পাই। তার একমাত্র কারণ, রাষ্ট্রনেতাদের এটা একটা চাল।

এখানে কথাটা আরও বিশদভাবে না বললে বিষয়টা পরিষ্কার হবে না, তাই একটু মুখ খুলতে হল। পৃথিবীর নানা স্থানেই ইহুদীদের বসবাস আছে, তারা ফিলিস্তানে ফিরে এসে একত্রে বাস করতে চায়। আরবগণ তাতে মোটেই বাধা দিচ্ছে না, অন্ততঃ সাধারণ আরব তাতে সুখীই হচ্ছিল। কিন্তু আমাদের দেশে যেমন এক শ্রেণীর লোক "বেংগল ফর বেংগলিজ্" বলে হঠাৎ "বেমারাইয়া" উঠেছিলেন, আরব দেশেও ঠিক সেরূপ এক জাতীয় লোকের মুখ হঠাৎ খুলে যায়। এসব লোকই আরবের পক্ষ হয়ে কাগজ-কলমে ইহুদীদের সংগে লড়তে থাকে। সাধারণ আরব সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করল না। তারপর যেমন করে আমাদের দেশের লোক দাংগা করে, তেমনি করে হল দাংগার শুরু। কিন্তু কতকগুলি লোক এতে একদম যোগ দেবে না স্থির করেছিল, তারা শেষটায় আর পেরে উঠেনি, তাদেরও বাধ্য হয়ে দাংগায় যোগ দিতে হয়েছিল।

যতটুকু কথা এখানে বলা হল তার কতকটা বেরুতে এবং কতকটা

দারেস্‌সালেমে সংগ্রহ করেছিলাম। ফিলিস্তানের ১৯৩৫ হতে ১৯৩৮ সনের সংবাদ এখানে এই বললেই যথেষ্ট হবে।

সমুদ্রতীরে বেশিক্ষণ না বসে আমরা বেরুতে ব্যবসা-বাণিজ্য স্থানে এলাম। স্থানটি বেশ সুন্দর এবং ইউরোপীয় ধরণে প্রস্তুত। স্তাম্বুল অথবা আদানার সংগে বেশ মিল আছে। পথের দুদিকে সুন্দর ফুটপাত। দোকানগুলি পথের উপর মোটেই ঝুঁকে দাঁড়ায়নি; পথকে প্রশস্ত রাখবার জন্যই যেন দোকানগুলি এরূপভাবে তৈরী। মালিক যদিও নানা জাতীয় লোক, তবুও তাদের পোশাক দেখে মনে হয়,—সবই যেন ইউরোপীয়। কংকণী বড়ই সাহসী, সে মাঝে মাঝে দোকানে দোকানে গিয়ে হিন্দুস্থানী ভাষায় জিনিসের দাম জিজ্ঞাসা করত—পথের লোককে পথের কথা জিজ্ঞাসা করত। লোকেও তার সংগে কথা বলে সুখী হত।

আমরা নানা কথায় সময় ক্ষেপণ করে, নানা পথ ঘুরে শেষটায় একটি জনাকীর্ণ কাফেতে গেলাম। আমাদের উভয়ের গায়েই কোট ছিল, কিন্তু নেকটাই ছিল না। হোটেল ম্যানেজার আমাদের এরূপ অবস্থায় টেবিল দখল করতে দেখেই ফ্রেন্‌চ ভাষায় কি বললেন, আমরা তার কিছুই বুঝলাম না। কংকণী বেশ আরবী জানত, সে আরবী না বলে হিন্দুস্থানীতে কথা বলতে শুরু করল। এসব দেশে আমাদের দেশের লোক গেলেই এরা ভাবে, হয়ত হজ্জ করতে এসেছে, অথবা হজ্জ করে ফিরে যাচ্ছে। টাকায় প্রত্যেকের পকেটই বোঝাই। ম্যানেজার রক্তচক্ষু দেখাচ্ছিলেন। স্থানীয় কালো আরবগণ তা সহ্য করল না, তারা এসে আমাদের কাছে বসল এবং ম্যানেজারকে আমাদের খাবার দিতে বলল। দুঃখের বিষয় সাদা আরব অনেকেই ছিল, কিন্তু কেউ আমাদের কাছে বসল না এবং ম্যানেজারকে আমাদের খাবার দিতেও বলল না। সাদা এবং কালোয় যেন কিছুতেই মিশ খেতে চায় না।

হোটেলে ফিরে গিয়ে আমরা একত্রেই রাত কাটালাম। কংকণীকে পরের দিন বলতে বাধ্য হলাম, এখান হতে কোন জাহাজে কাজ নিয়ে লণ্ডন যাওয়া তার উচিত। কারণ, বিনা পাশপোর্টে তার তুর্কীতে প্রবেশ করা সম্ভব হবে না। আমার কথা সে ভাল করেই উপলব্ধি করল এবং আমাকে সংগে নিয়ে অনেক জাহাজ কোম্পানীর অফিসে ঘুরে অবশেষে এক গ্রীক জাহাজে কুকের কাজ নিয়ে লণ্ডনের দিকে রওয়ানা হয়েছিল।

কংকণী চলে যাবার পর আমার মন আর বেরুতে থাকতে চাইল না, আমিও বেরুতকে পেছনে রেখে আতাতুরুকের দেশের দিকে রওনা হয়েছিলাম।

প্রথমবারে "বেদুইনের দেশে" আরবদের সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখেছিলাম, তা বুঝি পুরাতন কথায় পরিণত হল, ভেবেছিলাম। এখন দেখছি তা ঠিক নয়। এখনও আরব জাত যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেছে। বৃটিশ এবং ফ্রেন্চ সাম্রাজ্যবাদীরা আরব জাতকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেই, উপরন্তু আমেরিকার ধনীরা এসে আরব জাতের ঘাড়ে নূতন উপসর্গ হয়ে চেপে বসেছে। তিনটি প্রসিদ্ধ ভূতকে আরব জাত সহজে ঘাড় হতে নামাতে পারবে না। এই তিনটি প্রসিদ্ধ ভূতের চাপে সর্বসাধারণ হাপিয়ে উঠছে, কিন্তু ক্লান্ত আরব জাতের সামনে ভুয়া ইহুদী ভীতি এনে দাঁড় করা হয়েছে। ক্লান্ত কম্পমান অবস্থাতেও আরব জাত ইহুদী-ভীতিকে বড করে দেখে সাম্রাজ্যবাদী তিনটি ভূতকে ঘাড়ে করে হাঁটতে বাধ্য হচ্ছে। এ বিপদ হতে কখন যে আরব জাত মুক্ত হবে, তা অতীব চিন্তাশীল ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ বলতে পারবেন না।

ইউরোপ হতে বিতাড়িত এবং দারিদ্র্যের হাত হতে রেহাই পাবার জন্য দলে দলে ইহুদী প্যালেষ্টাইনে আসতে চেষ্টা করেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ইহুদীদের কখন বলছে, চলে এস, তোমাদের স্থান প্যালেষ্টাইনে করে দিচ্ছি, আর কখনও বলছে এস না। এটা হল

একটি চালবাজী। বিদেশের আরব-হিতৈষীরা যখনই শুনছে, ইহুদীদের আর প্যালেষ্টাইনে আসতে দেওয়া হবে না, তখনই তারা সুখী হয়ে বৃটিশকে প্রশংসা করে, আর যখনই শুনছে ইহুদী প্যালেষ্টাইনে আসছে তখনই তারা দুঃখিত হয়।

পৃথিবীতে যত ইহুদী আছে তারা সবাই যদি প্যালেষ্টাইনে আসে, তবে আরব জাতের ক্ষতি হবার কোন কারণ নাই। আরবদেশ আয়তনে ছোট নয়। ইহুদীরা যতই আরব দেশে আসবে ততই আরবদের উপকার হবে। ইহুদীরা আর পূর্বের ইহুদী নেই, তারাও মানুষ হয়েছে, তারাও লোক-সমাজে উন্নতির চেষ্টা করছে। কিন্তু অনেক আরব ইহুদী-ভয়ে মোটেই ভীত নন, তারা সাম্রাজ্যবাদীদেরই ভয় করেন বেশি। তবে কথা হল, তাদের কথা শুনে কে? আরব জাতের মধ্যে সোভিয়েট সৌহৃদ্য বেড়েছে এবং দিন দিনই বাড়ছে। যাতে আরব জাত সোভিয়েট রুশিয়ার দিকে না তাকায় সেজন্য নানারূপ প্রপাগাণ্ডা চালানো হয়েছিল, কিন্তু আরব জাত বড়ই এডভেনচার-প্রিয়, সেজন্য সোভিয়েট রুশিয়ার ভালমন্দ অনেক শিক্ষা করে সোভিয়েট রুশিয়ার দিকেই ঝুঁকে পড়েছে। এতে আরব দেশের শাসক-শ্রেণী কেঁপে উঠেছে এবং বৃটিশের আওতায় থেকে আরব-লিগ বলে একটি লিগ তৈরী করেছে।

বর্তমানে শুনা যাচ্ছে, ইহুদীদের তৈরী পণ্যদ্রব্য আরব লিগ বর্জন করেছে। মিশর প্রভৃতি দেশে যাতে ইহুদীদের তৈরী কোনও মাল না পৌছাতে পারে তারও ব্যবস্থা হচ্ছে। আরব জাতকে ইহুদীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে। আপাতত আরব লিগ-বিজয়ী হয়েছে বটে, কিন্তু আরব জাত ভারতবাসী নয়, তাদের রাষ্ট্র-নীতিতে বেশ অভিজ্ঞতা আছে। তবে কোনও বিষয় জানা অতি সহজ, আর ঘরে বাইরে প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হওয়া আর এক বিষয়। আরব জাতকে যদি বাঁচতে হয় তবে ইহুদী-ভীতি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ইহুদীদের সংগে করেই পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।